San Fran, hipster land, Jazz sounds, wig sounds,

Earthquake sounds, others,

Allen on Chestnut Street, giving poetry to squares,

Corso on knees, pleading, God eyes.

Rexroth, Ferlinghetti, swinging, in cellars,

Kerouac at Locke's, writing Neil on high typewriter,

Neil, booting a choo-choo, on zigzag tracks.

Now, many cats falling in, New York cats, too many cats,

Monterey scene cooler, San Franers, falling down.

Canneries closing. Sardines splitting for Mexico. Me too.

এই সংখ্যায়

Page 1 : কবিতা : বারীন ঘোষাল, রাধে ঘোষ, রবীন্দ্র গুহ, মলয় রায়চৌধুরী, স্বপন রায়, জপমালা ঘোষরায়, ইন্দ্রনীল ঘোষ, উল্কা, নবেন্দু বিকাশ রায়, অভি সমাদ্দার, দীপঙ্কর দত্ত

Page 2 : স্বকাব্যকথন : প্রণব পাল, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, রঞ্জন মৈত্র, যশোধরা রায়চৌধুরী, ধীমান চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি বিশ্বাস, রমিত দে, দেবাদৃতা বসু, জয়শীলা গুহ বাগচী, দেবযানী বসু

Page 3 : কাব্যানালিসিস : অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাপদ কর

Rune is busting out all over—perfidious quarrel কবিতা **sublates even the heckling at the Ponderosa.**

বারীন ঘোষাল-এর দুটি কবিতা

বাড়ি ফেরা

রাতের দূরে তিছোট্ট এক পা
চটিত চটুল শব্দ বারে বারে

সকালে সকাল আঁকা খেলনাগাড়ির ভোর
এখন বৃষ্টিতে ভিজছে
দূর বীন থেকে বাতাস হেলেছে এবার
বাড়ি ফিরে চলো বাড়িকে ফেরাও কোথায় বাড়িতে চলো

নুনছালের ওপর বাঁকাকাশের ছায়াভলক গাড়ি ফুঁ দিচ্ছে না
ল্যান্ডমাইনের মাইমে বসা আবহবার্তায় নয়েজ ইলেকটনি চলবে এখন

নয়েজে নয়েজের তার
তারে তারে শিশুহাসির ধারণা
ধারণাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে নয়নময় হাসপাতালের অ্যানিমেশন
উইন্ডো গবাক্ষে জানালাকার আয়তছবিগুলো যার পর
মগডাল
পাখিবন্দর
লগবুক র‍্যাডারে অধরের স্কুটার চিহ্ন
জন মানুষ নাই

বোতল ওপেনার
চলা ফিরিয়া বাড়ি খালি বোতলের মধ্যে
জ্বলন্ত দেশলাই ফেলা দপ্ করেছে ভুক
দেশলাই কারখানার মাথায় উড়ছে স্বাধীনতার তর্জমা

বারান্দাটা আমার ভেতর দিয়ে গেল
রেখে গেল স্যাভলনের গন্ধ কুঠার
বিজলিবাতি আবিষ্কারের গল্প পিছিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন
শ্রমিকদের রাকস্যাকে ঠাঁই হল না
লোটা কম্বল অচেনা ঘুঘুর
বাড়ি ফিরে চলো পায়রা পারারা
পারাদের মধ্যে হাওয়ারা

হাওয়ার মধ্যে মনরা মনের অপেক্ষা করছে তুবড়ি ফুলঝুরি
বাতানুকুল মনটার কার্টুন দেখে যাও

শব্দের মানে

যেমন ইথার শব্দটার মানেই আমরা জানতাম না
প্রাণ শব্দটা
ভালবাসা ঝুমকে আছে
অমলতাস
আর চমকে যাওয়া ঈশ্বর
আমাদের শান্ত থাকতে দাও
যেমন ঈশ্বরের মানেই আমরা জানতাম না

তখন আমি ঘুরে দাঁড়াই
তখন আমার পা-ও ঘুরে দাঁড়ায়
পৃথিবীটাই ঘুরতে থাকে টের পাই না
দরজা ঢোকার আর বেরোবার দরজা বদল হতে থাকে
একটাই সুড়ঙ্গ আস্তে
রঙ্গীন হয়ে যাই
পাখি-কলোনি আমি একদম চাইনি এখানে

গাছে ফুলের গন্ধ
গন্ধের কোন নাম নেই
শহরের নামগুলো প্রিয়বন্ধুর নামে বদলে যায়
তখন মনে পড়ে আমার শহর সুলতা

রাধে ঘোষ-এর কবিতা

ন্যানো

বউলমধ্যের ঘুমগুলিকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, আবার তার
মধ্যে ঘুমুতে যাচ্ছে নিঃস্বর পদ, এভাবে নিমেষব্যাঘ্র
পালক রেখে যায় ছোট ফল্কন, গুল্মসিংহের দ্বিপদ শেকড়
তারও নীচে অমাবোতলসমূহ
হিমায়িত কোদাল চালনায় কোন শীর্ণতোয়া, কব্জি কিম্বা
এক দর্জিনিবিড় অক্ষরের ভুষো

দিনমানে সর ভাসে, সূচীকাজ ফুলস্লিভ এটিয়েমে
সার্সিফগের ওপারে হাবাব, নিঃশব্দের বিপকেন্দ্র
আকাশমনির ছোট ছোট গেলাসে গেলাস জলোত্তল স্কেচ
বেতাল ঝুলছে নাক, ডোরের গ্রীবায় অবদেশ নিসর্গ
চক্ষুর হলুদ বিভাজিকা চোখে পড়ে

ক্যাম্পফায়ারের তুমুলে ল্যান্ড করে পাতার আড়াল
আমাদের কর্মশালা, থুৎনিতে কার্বনকৌটো খোলো
বৌলস্বপ্নের দর্জির কব্জিতে অক্ষর নামুক ব্যেপে
থুৎনির মুন্ডি দ্যাখে অন্ড খন্ড স্পিরিটাস

রবীন্দ্র গুহ-র কবিতা

আত্মা ও সুন্দরের আত্মচর্চা

সুন্দর এবং আত্মা বিষয়ক বিতর্ক আছে

আত্মার কোন অবয়ব নেই আলোর নিকটস্থ আলো ছইদোল
পথ হারানো আর পথ খোঁজা রামকেষ্ণর জালিভাষণ
সুন্দরের শরীর আদ্যন্ত বাস্তব- রহস্যময় □
আঁশঠে বীর্যগন্ধময় যোনি নাভিতল ভৌগলিক বুক
বুকের অষ্টতল ছলাং মারে □ ঈর্ষা ক্ষুধা ঘেন্না ও আগুন
এই তো ঠিকানা, জীবনের আয়তনে কতো যে কেলো □
ঝড় বয়, দু- পাশারি হাওয়া যাপন- জ্বালানি
কেউ কি জানে জৈগুনের পদ্মে কি ভয়ঙ্কর মুগ্ধমাতন !
কীটের কুসুমে গুঁড়োগুঁড়ো জলকণা লিপ্সা □ লোভেচ্ছা □
বাক্যবর্জিত অর্জুন, এই নাও সংগমের সাজ, থরে থরে জ্যোৎস্না
উপুর- বুকে গড়িয়ে দাও হারানো পাশা □
ছলছল ধ্বনির মতন জীবনের শেষ বাক্যটি
আত্মার ইশারামাত্র □
উনি তিনি উহারা তাহারা সবাই অর্বুদ অর্বুদ ..... অর্ধার্ধ অর্ধার্ধ .....
কোষপ্রমাণ
যোজনপ্রমাণ
অন্ধকার
আলো □
শ্বেতবর্ণ নীলবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ .....
ইহ আত্মা ইহ সুন্দর বহুদিশাময় শুভাশুভ হর্ষোল্লাস □

মলয় রায়চৌধুরী- র কবিতা

চিতল হরিণী

তোকে ছুঁই, কি মসৃণ তোর দেহের করুণা, দয়া আর চাউনির কৃপা
জানিস সৌন্দর্য তোর কিসে ? দিতে পারবার ক্ষমতা ও কৃতজ্ঞতায়

যখন আঁকড়ে ধরি গলাখানা তোর, মুখে মুখ ঘসে দিয়ে আদর করিস
সৌন্দর্য মানেই যেন আত্মবলিদান, কী করে শিখলি এই ভালোবাসা !

চিতল হরিণী তোর চোখের গভীর থেকে ধর্মাধর্ম শুরু হয়েছিল ;
বনের চঞ্চল দেবী, লোভ দেখাস জাগতিক বস্তুফাঁদ ছেড়ে থেকে যাই
হাজারিবাগের এই ঘন জঙ্গলে ; সমাজ-সভ্যতা থেকে দূর ইন্দ্রজালে
প্রতিদিন আদায় করিস তোর জিভ দিয়ে পৌরুষের যৌননির্যাস--

প্রথম-প্রথম কাতুকুতু লাগত খসখসে রহস্যের জিভের প্রণয়ে
এখন নেশা ধরে গেছে ; কখন ফিরবি তুই বনভোজন সেরে সন্ধ্যায়
অপেক্ষায় থাকি । জন্মউলঙ্গ তুই, আমি তো ইনফিডেল, তোর কাছে
শিখলুম উলঙ্গ থাকার ইনোসেন্স, সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার যৌনতা ।

স্বপন রায়-এর দুটি কবিতা

শিসকি ১

দেরি হতে পারে তাড়াতাড়ি পারে কেউ কেউ
লাগালো
হয়ে গেল
স্ক্রু-আঁটা জানালা হয়ে যাওয়া চাঁদ তো লিখলাম
চাঁদ□কে ফোটা, মদ দিয়ে ভাব
উর্দু দিয়ে ভাব

ভাবনাও দেরিতে
শাদা স্ট্রোক মারিজুয়ানা একটা বা দুটো রেল-ইয়ার্ড একটা কালো লোক গিটার বাজাচ্ছে
তো কে আর ডাকবে, লাভ-ওয়ান লাভ-টু

একটু ভাব, মদ দিয়ে, উর্দু দিয়েও

দেরি তো হবেই, একটু
দেরিতে মিশে আছে লোকোমোটিভের কষ্ট, হবে না ?

শিসকি ২

শেষে হাওয়া তবু পড়লো না পাতা
নাকি পাতা পড়লো না, হাওয়া পড়লো না এখানে

একটা বাড়ি, এখানে বৃষ্টি খুব হচ্ছে, এখন বৃষ্টিরও কি খুব হচ্ছে, ওখানে
একটা চারইয়ারি গাছ, শাদা বাকল, ওখানেও কি হচ্ছে
যাওয়া আসা পড়ন্তর

এখানে বা ওখানে যা ছিল না, সেই যে রবার বাগান, আমি রবার বাগানে
শুনছো আমি রবার বাগানে

আর এত আঠা, কিছু আর কি ভাবে পড়বে

জপমালা ঘোষরায়-এর দুটি কবিতা

নবারুণের পর তাঁর উপত্যকা

কর্কট রাশীচক্রে কোন প্রেত ডেকেছিল ভুশুণ্ডির ডাক, কোউন শালা কার বাচ্চা এক পাতে খেয়েছিল মায়ে আর ছায়ে ? মহাযান আয়না জুড়ে বমি আর বমনের দাগ ! আগুনের মুখে ছাই দিয়ে কদলীবালারা কদলীকান্ডের মতো সকলেই বেঁকে বেঁকে নুয়ে গেলেন নমনীয়

সংবিধান পলিমাটি প্রতিষ্ঠান ছুঁয়ে। শাক দিয়ে বড় বেশী মাছ ঢাকা হল। লেপা হল দাদ হাজা চুলকানির ব্যর্থ মলম।

অতিবাম প্রান্ত থেকে সংক্রামক ফ্যাতাড়ুর ফ্যাৎ ফ্যাৎ সাঁইসাঁই. . . . গর্জনের কোরিওগ্রাফি গর্জনের চেয়েও ভীমনাদ। আপনি উড়মান রাখলেন মহান শ্বেতকপোত অথচ গলিঘুঁজি কোণকোণ ভরে গেল চূড়ান্ত পেট্রোলে. . . . আগুন নেভাতে চেয়ে আগুনের সমিধ সজ্জায়।

প্রহরীর কফিনের পাশে জেগে আছে প্রত্যয়. . . একাকী অতন্দ্র ভোরতারা. . . . রক্তাক্ত সূর্যের জন্য. . . আটপেয়ে বন্ধন উপেক্ষা করে মৃতদেহগুলো থেকে উড়ে গেল বিনুদের অবাধ্য চাদর. . . চিহ্নেরা চিহ্নের জন্য আউলে বাউলে কাঁদলো কিছুক্ষণ। তারপর করণীয়ের পশ্চাৎদেশে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ঢুকে গেল।

শুধু হারবার্ট একাই ফেটে গেল. . . . .

জানান দিয়ে ফেটে গেল চুল্লির ভিতর. . . . .

সিরিঞ্জ- ২

আমি তোমার প্রেমে বিপন্ন সিরিঞ্জ বারবার ভেঙেছি ডায়েরির পাতায়. . . . গিলে খেয়েছি কলঙ্কভাগ. . . .

ব্যাঙ কাটার ট্রের পাশে আলপিনের স্বেচ্ছাচার বনাম মৃত কোশের গায়ে প্রান্তিকের মাটি। ভোট দেবেন কোন চিহ্নে ?

সম্পূরক ভাবনাদের কোন নিজস্ব এয়ারলাইন্স নেই তাই বলে কচি কচি কপিপাতার রোঁয়াগুলো শিশিরের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে না তার কোন মানে নেই। পালংশাকের ভেষজগুণ অব্যাহত থাকতে থাকতে কেউই তো পৌঁছে দিল না প্রসূতিকক্ষে। এই তো সেদিনও দেখলাম লালসেলামের মতো লালসিরাম অধ্যুষিত সিরিঞ্জ প্রবেশ করানো হচ্ছে তরমুজের ভিতর। তরমুজ এখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শব্দ।

বাতুল থেকেই বাউল আমি জানি। তবু বাতুলামি ছেড়ে দিয়ে বাউলায়নে ফিরে আসি সক্ষম অক্ষম। মশগুল আগুনে সেজে উঠলেন মানুষখোঁজা বাউল ও সহজ মা। ছুঁড়েমারা সালফিউরিক অ্যাসিডের পরোয়া না করা এই রবীন্দ্র গানটা খুঁজে নিতে আমাকে যেতে হয়েছিল রবীন্দ্রসদন সংলগ্ন উড়ালপুলে।

হলুদ ধোঁয়ার নীচে কবিতা উৎসবে তখন চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে । আমরা ভেবে করবই বা কী ? উড়ালপুলের নীচের ভিকিরিরা ?

ইন্দ্রনীল ঘোষ-এর দুটি কবিতা

ফাতনা

ধরা যাক, আজসেই প্রথম দিন
পৃথিবীর ইয়ার্কি টানা কাজলে সূর্য উঠছে
আর তারই নিচে নীল গড়তে শিখেছে মানুষ

মানুষের ক্লাস
ব্ল্যাকবোর্ডে কুহু-কেকা গর্ত খোঁড়ে ইতিহাসে. . .
হাতের লেখার নিচে জমা হয় হাতের মালিক

তার আঙুল বরাবর জাল পেতে দিই, চলো
দু একটা প্রথম দিন ধরা যাক. . .

সম্

এসবই ঈষৎ সা- রে- গা- মা
দিন চ□লে যাচ্ছে
ফেঁসে যাওয়া শস্যদানায় খিদে পরিষ্কার করছে মা
তার প্রাচীন জ্যামিতি খুলে
তারা জুড়োনো গাঢ় ছুটি

অবসর পাওয়া আলো এত শান্ত □
নেহাতই গান ধূ- ধূ করে

উল্কা-র দুটি কবিতা

ড্রিম ক্যাচার

জরাস্বপ্নে গোটানো পাশবালিশ থেকে
পাশ ফেলের সাফাইওয়ালাদের
বুড়ো আঙুলে সংক্রমণ ছড়ালে
একপাতা ট্যাবলেটের আয়ু কমতে থাকে।
একহাতের তালি
অন্য হাতে ওঠে
বেলুনে ফুঁ হয়ে মিলিয়ে যায় নিরোধ

শৌখিন আত্মহত্যার সামর্থ যাদের নেই
তাদের ভোঁতা অক্ষর
জোকারদের পেটে ছোট বড় সার্কাসের
জাগ্লিং প্রভেদ করে।

টিকিটঘরে গ্যালারি ভরে যায়

স্লো মোশনে খসে পড়ে কিছু পায়জামা
ট্রাপিজের জালে আছড়ে পড়ে আলোখোর পোকা
ডিম ফুটে একটা ব্যাঙ বেরিয়ে আসে
জৈব সারপ্লাসে
মাছিরা কখনও উল্টে পড়া জিভের স্বাদ পায় না

জোকারেরা আইফেল টাওয়ার হতে শিখলে
হুইল চেয়ারে উঠে বসে গোটা প্যারিস।

সরগ র ম

তোমাকে জমিয়ে রাখছি নিঃস্ব হওয়ার আগে-
যে খাতে কিছু ডিগ্রী সেলসিয়াস জাপটে
কয়েকটা গীটার তানপুরা হয়ে যায়।

তুমি গানের মুখে পড়
ভারখয়ানস্কে সমস্ত তরোয়াল দীর্ঘ হলে
শব্দ তরঙ্গ যুদ্ধে
কাটা পড়ে সাদা রুমাল
রাস্তা কাটা বেড়ালের কক্ষপথে
হাতিয়ার সামলে নিয়ে তুলো ছুঁড়ে দাও
যারা ওই আঙুলে জুটেছে
পতাকায় স্বাধীনতা পাক
অথবা রঙের মিনার
অসমাপ্ত দুর্বোধ্যতার নৈবেদ্য ভাঙছে
পরবর্তী পঞ্চাশ সেকেন্ডের তৃতীয় বিশ্ব

বাইবেল মলাটে নিখোঁজ কোনো
ক্রুসেডে আঁচড় কাটা বর্ষার খুঁত
হাত বদলে, হুলিয়া বদলে,
ধরে রাখো তুলো অপচয়

যার দণ্ডে কেউ রাজা হয়েছিল. . .

নবেন্দু বিকাশ রায়-এর কবিতা

সান্দাকফু, ১৭ই নভেম্বর, ২০১৪

ওল্টানো, মরা বোতল গাঁথা সীমানা।

আপ্তবাক্য লেখা হয়েছে ভেবে নত, অতঃপর মরে যাওয়া ছাড়া
মানুষের কোন কাজ নেই।

একটি পিঁপড়েকে ডিম মুখে করে সীমানা পেরোতে দেখেছি
সীমানা তার নিষেধটি কেটে খায়।

নিছক সন্তানের জন্য ঈশ্বরী হয়ে ওঠা একটা মানুষ
আঙুল দিয়ে দ্যাখে
কিভাবে কমি আলো রেডবুক ফেলে গ্যাছে বরফের ক্ষতে;
উপমা তাহলে কোথায় আছে? টয়লেট থেকে লাফিং ক্লাব
এই একটাই প্রশ্ন তাড়া করে, উপমাকে খুঁজতে গিয়ে উচ্চতার ভুল হয়ে যায় বারবার।
সর্বত্র বোতল দেখি, ক্রমশ টের পাই বোতলের ভেতর তুষারযুগ আসন্ন,
শীতে না সিতাংশুতে কে জানে

বোতল তো নিজেকে ভেঙেছে রক্ত দেখবে বলে. . .

ওল্টানো, মরা বোতল
একটি পিঁপড়ে তাকে জয় করেছে, এভাবে সীমানা গিলে খেল নিজেকেই
নখ যেভাবে উপমা খুঁটে খায়।

অভি সমাদ্দার-এর দুটি কবিতা

কথন- ৭

শীর্ণগুলি ফুটে ওঠে রোজ

শিমূলগুলি ফেটে যায়

যেন টলটলের আদল

নিচু নিভু
নিভু নিচু

কতো চিনচিনে বরোজ

বরোজ- বুনন
দিনগুলি

আহা তরল তিরতির!

কথন- ৯

তাঁতের নিভন্ত
স্বর হয়ে
শুয়ে থাকি

পলক দৃশ্যের
চিলতে স্বজন!

যেন গঠন পাবে না
কথনপরাগ!

বিভার হৃদম

যেন চিৎবুননের শীর্ণ

একটু ত্বরিত হাল্কা
একটি খামোশ- চিত্রল

দীপঙ্কর দত্ত-র দুটি কবিতা

ক্রিয়াদোর দে সের্দোস

স্লটার্ড ফেদেরিকো। রহমকরমে শাটল শুঠো কর্কমাংস লাফাচ্ছে চৌখুপী এছিলা ওছিলা গুটিয়ে যেতে যেতে গুন্হেগার জিভেরা যখন ইভা ব্রাউনে পাশ ফেরে
রিখটারে হেমন্ত এলো আর ধানের কাচ্চি গতর দেখে একেকটি লাইক লাইলাকের সঙ্গে

মৃত একটি একটি করে ভেসে উঠলো পেট ডাগরা গোল্ডফিশ
স্কুলস্কার্ট ও হ্যান্ডকাফ ফেটিশ গলে গলে সেঁজুত ফুটলো অথচ পায়ের বাক্যি ফুটলো না বালুরেণু
ল্যাটিনা মম্ ও স্টেপটিনের ব্লোজবে নদীমুখ তুবড়ে ব-ব হনু ও কণ্ঠা জেগে উঠছে দ্বীপ রীফ ফ্রন্টোটেম্পোরাল
সওদাগরের বাঁহাতি ফুলে যারা ফেঁপে উঠছে কানী চ্যাংমুড়ি,
দাক্ষিণ্যের সুরাসারে হারেম ও সিস্টিন চ্যাপেল আলো করে খোজা বিদুষক,
জিভ উপড়ে নিতে গিয়ে তাদের শুনছি তীক্ষ্ণ সেরিনাড, ডাইকো টমি ঘেউয়াচ্ছে জুলির নয়ান দীঘলে
জল ছলাতে নিকানো পাররা, ভলভো গ্রাফিত্তি থেকে নেমে তবায়েফদের কেলি ও স্প্ল্যাশিং ডানসিনান
পাখিরা ঝুমকো ঝুমকো আইনা ঝুলে আছে চিকুরে লতিতে অথচ দের-সবের আলোধ্বনি ঠিকরি নয় আজ
ব্লিড ব্লিড পুওর সোয়ান অ্যান্ড য়ু ব্লাডি সোয়াইন ব্রীডার
চপ্পল সারাতে গিয়ে বারবার গ্রেনেড সেফটিপিন খুলি ফলে বারুদ আজশুয়োরের হজমি চূরণ

মূককীট

ঢেউরা ঢুলছে নিভু ফিলিপ্পিনো হ্যারিকেন ছায়ায়
আর চুরাশি লক্ষ কিউরেরি তিরে ছন্নি ছন্নি সোহাগচাঁদ ফিনকি এসে পরেছে ভ্রমণে
হাম্পটির এক হি থালি কে যারা হমদর্দ চট্টে বট্টে,
গ্রেট ফলের আগেই অল্টোফোবিয়ায় ফেটে যায় তাদের ধোঁয়াশলা শেল স্ক্রিপ্ট
আধখাওয়া নিষিদ্ধ টেরিডোফাইটা বিষিয়ে তুলছে পিরানহাঁয়ের ম্যাডাম ডব্লিউর রুট ক্যানাল
অথচ কপাটি খুলছে না, শাবল চাড়ে পিউপায়ে পায়ে দংষ্ট্রার লার্ভারা উড়াল দিচ্ছে প্রিমাভেরা ঋতুদের দিকে
অতঃপর হামিং কোমাটোজ অতঃপর প্রশান্তির পেন্টোবার্বিটাল
রেপ বলবেন না, ভার্টিক্যাল স্মাইল নয় স্যার, ইটোয়াজ অ্যানাল, অ্যানাল

She has come possessed

Who admits the delusive light through the bouncing wall,

Possessed by the skies

She sleeps in the narrow trough yet she walks the dust

Yet raves at her will

On the madhouse boards worn thin by my walking tears.

SIONALLY TALKS
MISSION A PHYSICIAN
IF LIFE WAS WORTH
PROBING FOR
ATENED TO HURT
MOTHER? GENNIE
PONDED: I HAVE
WERE RELEASED
ADMISSION A PHYSICIAN NOTED
COOPERATIVE IN WARD AND ROUTINE
ADMISSION A THERAPIST ASKED GENNIE
FELT NORMAL. SHE SAID: EXCEPT FOR THE
TENDENCIES. ASKED IF SHE HAD ANY ENEMIES.
WAS AN ENEMY BECAUSE HE HAD THREATENED
BEATEN HER UP, SLAPPED HER AND TORN THE
IF HER MOTHER WAS AN ENEMY WHEN ASKED
GENNIE RESPONDED: "HAVE EATEN THINGS I DON'T LIKE BUT I
WHAT SHE WOULD DO IF SHE WERE R
LIKE TO HAVE A JOB.
PATHOLOGY SHORTLY AFTER
EEMELY QUIET BUT FRI
SHE REPLIED SHE FELT
NORMAL EXCEPT
PATIENTS... SHE IS NOT
ADMISSION A PHY

আ ক্রিয়েটিভ "খ্যাক্ খ্যাক্"

প্রণব পাল

এক সময় আমার ভাষাবদলের কবিতাকে যাঁরা উদম মাঠে শিকার করত আজ তারা ছাড়াও আরো অনেকেই ভাষাবদলের গোপন স্বীকারি। এ কথা বলার কারণ আমার কবিতার যাঁরা পাঠক তাঁরা সকলেই জানেন। কিন্তু এই পর্ব শুরু হওয়ার একটা প্রেক্ষাপট ছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ম্যাজিক ক্যানভাস" বেরিয়ে যাবার পর বেশ কিছুদিন আমি নিজের লেখায় বিরক্ত ছিলাম। পংক্তি জুড়ে দশকের পর দশক একই শব্দের পুনর্ব্যবহারে আমি নিজে কবিতা লেখার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধুই মনে হচ্ছিল আমরা সবাই একটা ছকবদ্ধ ধ্বনিগ্রাফের মধ্যে নিজেদের নানান ব্যায়াম কসরতে কবিতাকে একটা অভ্যাসে লিখে চলেছি যার ৮০ ভাগ শব্দেই আমার নিজস্ব কোন অধিকার নেই। কোন নিজস্বতা নেই, যেন একটা পারমুটেশনের মধ্যে ভাবনা নয় কথা ও বিষয় প্রকাশ করছি। বিরক্তি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে নিজের কবিতা নিজে পাঠ করার জন্য যেটুকু আত্মবিশ্বাস, ভাললাগা, আবেগ, ইচ্ছা থাকা দরকার তার কোন হদিস পাচ্ছিলাম না তা হলে লেখায় কী ঘটছিল বোঝাই যায়।

তো এরকম আত্মবিশ্বাসহীনতা নিয়ে একদিন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মাঝখানে ৭/৮ টা লেখা পাঠ করি অত্যন্ত হীনমন্যতা নিয়ে। তখন বন্ধুদের মধ্যে একজন আমার লেখার ও দুর্বলতার এই অবস্থা দেখে খুবই অসম্মানজনকভাবে "খ্যাক্ খ্যাক্" করে হেসে ওঠে এবং অন্যেরা নীরব থাকে। ভিতরে ভিতরে অপমানের লজ্জায় আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি। নিজের কাছে অপমানের গ্লানিতে সেদিন প্রায় ভিতরে ভিতরে ডুঁকরে উঠেছিলাম। নিজের প্রতি, নিজের লেখার প্রতি একটা অসহ্য বিরক্তি ও যন্ত্রণা নিয়ে সেদিন একা একা ফিরেছিলাম আর আমার কানে, মাথায়, মগজে, মনে, আত্মসম্মানে একটা "খ্যাক্ খ্যাক্" অনবরত ইকো হচ্ছিল। বাড়িতে এসে সমস্ত লেখা ছিঁড়ে কুঁচিকুঁচি করে ফেলেছিলাম আর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এরপর আর যাই লিখি, যত খারাপ লেখাই লিখি লিখি এই হেজেমজে যাওয়া কবিতা যা আমার আত্মবিশ্বাস ভেঙেছে, মন লিখতে চাইছে না, তা অন্তত লিখব না। সেদিনই বসেছিলাম এক উদ্ভট শব্দ লিখতে যা প্রচলিত ফোনেটিক্সের বাইরে। এভাবে ১৯৯৩ সালের কোন একটা মাসে আমি পাঁচটা ভাষাবদলের কবিতা লিখি এবং ছাপার আগে কাউকে পড়াইনি পর্যন্ত। সে সময় রতন দাস আমাদের "কবিতা ক্যাম্পাস" সম্পাদনা করছিল। ওকে বলেছিলাম, আমি ৫টি লেখা এ সংখ্যায় দেব, কিন্তু ছাপার আগে কেউ দেখবে না। আমার কবিতা যখন compose করা হবে বলবি তার আগের দিন প্রেসে দিয়ে আসব। রতন কথা রেখেছিল আর এই কবিতার প্রথম পাঠক বোধহয় সেই প্রেসের কর্মী যাকে আজ আর আমারও মনে নেই। বিশ্বাস ছিল এ লেখার জন্য দুটো চিঠি আমি অবশ্যই পাবো তা খারাপ অথবা ভালো যাই হোক। তারা দুজন হলেন - (১) বারীন ঘোষাল (২) স্বপন রায়, আর ঠিক হলোও তাই উপরন্তু আরো একজনের চিঠি পেলাম তিনি সুশীল ভৌমিক। এর পর

১৮ ছাড়িয়ে ২০- ২২ বছর তাকে ক্রমশ শানিয়ে তোলার কাজ জারি আছে। এখানে ১নং ভাষাবদলের কবিতার সঙ্গে এখনকার পরিবর্তিত ভাষাবদলের কবিতার ১টি পাঠালাম। ভালো লাগলে ছাপো নয়তো ছিঁড়ে দাও আমার দিকে। দেখি "খ্যাক্ খ্যাক্" কত দিনে "দ্যাখ দ্যাখ" করে ওঠে।

সর্বপ্রথম লেখা ভাষাবদলের কবিতা (১৯৯৩)

ভাষাবদলের কবিতা ১

সূর্যকে প্রদক্ষিণোচ্ছে গ্রহ। গ্রহ কে উপগ্রহ। সব রাস্তা মুখে জট, ভাঙা পলেস্তারিও অবরোধ।
আগুনীর বাচ্চা জ্বলতে জ্বলতে ঘরদোর ছাই হয়ে বিন্দুর মধ্যে লুকোলুকি। শব্দজেরক্স ওড়া স্বপ্নিয়ে
দস্তানার শ্যাওলা সুতরো সাফ। হামলানো পাঞ্জাশীত, অন্ধকারানো, ক্ষার ক্ষওয়া ছালচিত্র প্রদর্শনী
ঝেড়ে এই তোরজোড়িয়া কতটা টুংটাংশীল ! পৃথিবী মুখ ঘুরিয়ে ছুটছে অন্য ভুবনে। উল্টোদিকে
একা ওড়ে পাণ্ডুলিপি। ডাক ছাড়া বেহারা উত্তর। তালুতে মাটিয়ে ধানবীজালে হাওয়া, মুদ্রালে ঘুরে
যায় আহ্নিক বার্ষিক। তো নাচা কোঁদার চেয়ে তুড়িয়ে, গ্রহকে ঘুঙুরিয়ে ঝাড় আলিয়ে জলসা আর সূর্যোনো।
গ্রহরা সূর্যের রেণ্ডি। রেণ্ডিরা সূর্যের গ্রহ উপগ্রহ।

অধুনা লিখিত ভাষাবদলের কবিতা (২০১৫)

ফিঙ্গারপ্রিন্ট

আঙুলে বিমূর্ত সমাবেশ,
নিঃশব্দের ফিঙ্গার প্রিন্ট পড়ছে।
কোথাকার জল হাই তুলছে কোথায়!
একমুঠো ছলচ্চিত্রে
সত্যি ধুনছে বেঘর দরজায়।
আনজান কথারা মুদ্রায় ফুটন্তিকা।
একমেঘ জলবায়ু

ভোল ও ভোল্টেজ সমেত ফিরিয়ে পরে
নিসর্গের সংজ্ঞা

মিউজিক্যাল চেয়ার থেকে
তুলে আনা অদৃশ্য ঘিলুর
পেন্টাগণিকা- ল
মিউজিয়াম।
একটা ফুল ফুটছে কোথাও সুন্দর নীরবে।

হাতছুট সময় চলে যায় সিগন্যাল ছাড়িয়ে।
আমিংকার ঘেরা ক্লোনিতের জ্যর্নি
মুসাফিরি জানে না।
চলন্ত কলমে ধুন্ শোনার কান পেতে আছে
মহাকালের ন্যাংটো আকাশ।
আশ্চর্য্য প্রদীপ নেভে হাওয়া পাগল উঠোন বেলায়।
সাদা পাতার উদাসীনে ভাইরাস।
যুদ্ধহীন রণাঙ্গন জুড়ে লুডো খেলে
সেনসেক্সোয়ারের তেজি ঘোড়া।

উটের শীতল গ্রীবার আঁধারণ্যে
একঝাঁক সূর্য প্রসব পাড়ছে
নীল প্রেগনেন্সী।

স্বকাব্যকথন

আপনাকে মনে পড়ে, প্রিয় চ্যাপলিন
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

(প্রসঙ্গ : "দার্জিলিং ১৪ই" শিরোনামভুক্ত কবিতা)

একটা বিন্দুর গল্প তোমরা জানো। যাকে কেন্দ্র করে বৃত্তরূপ ঘনিয়ে ওঠা ছিলো। ছিলো শিকড়বাকড়ের চোরাস্রোত। সে এক ওষুধের আর ক্লোরোফর্ম পেরোনো শ্রাবণকাল। সেখানে পর্ণমোচী অরণ্যের কথা ছিলো। পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু- - - এরকম লেখা ছিলো, ধরা যাক। পায়ের ও তো পাতা থাকে আর তাকে যদি মাটি ও শূন্যতার মাঝামাঝি অনেকটা সময় টাঙিয়ে রাখা যায় তবে স্পর্শবিন্দু ফিরে পাওয়ার মুহূর্তগুলো অবিশ্বাস্য দামি হয়ে ওঠে। সেরকমই এক ফিরে পাওয়ার কথা ঝরে পড়ছে। এই এপ্রিলের হু হু ঠান্ডা হাওয়া- - - ভেতর অবধি কাঁপিয়ে দেওয়া ভেজা বাতাস তোমার চুলের এলোমেলোয় হঠাৎ জোনাকি। অতল ঘুমের দেশে তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত থেকে হাত ধরে তুলে এনে আবার যখন হাঁটতে শেখাচ্ছো- - - তখন এই কুয়াশার হালকা জলরঙে ধেবড়ে যাওয়া পাইন ফার আর লাইকেনের সবুজের ভেতর কত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে আসার শব্দ।

"অনেকটা ডিঙ্গিয়ে যাওয়া জলের শব্দ
এরকম বাস্প অনুবাদ করে করে
পাতা থেকে স্পর্শ খুঁজতে গেল
পাইনের ঘনিয়ে ওঠায়
কফিশপের গড়ানে চাঁদ, সেই পুরনো"

আকাশের দিকে উড্ডীন লালনীলহলুদগোলাপিসবুজ। সব জড়িয়ে মড়িয়ে উলটে যাওয়া রঙের প্যালেট। শ্বাস ভারি হয়ে আসছে। পা ঠিক মত পড়ছে না। একটা ব্যথা উঠে আসছে গোড়ালি থেকে জানুর দিকে। তবু তো পা। জানান দিচ্ছে- - - আছি। তোমাকে ছেড়ে যাইনি ওই কাষ্ঠখন্ডের ওপর। কিছুটা আলো লেগে আছে আঙুলে- - - জুতো খুলে ফেলি, মোজাও। ঠান্ডা বিঁধছে- - - - আহ্। সাদা বিছানা, শূন্যের কাছাকাছি একটা ধাতব ঘর আর তেজস্ক্রিয় রশ্মির ওই স্পেস্‌শীপটা- - - - যেখানে সেকেন্ড আর মিনিটের হিসেবগুলো অনেকটা অন্যরকম। ওসমস্তই এখান থেকে ভাসিয়ে দিচ্ছি শূন্যে। হাত ধরে আছো- - - ।

"আর ক্রমশই
রঙিন নিশানের মখমলে
বিবৃত কুয়াশায়

ঢালু ছুঁয়ে উত্তল বিছিয়ে রাখায়
কতকাল বিরহ মেলেছে অপরূপ
সেই থেকে শীর্ষ অবধি গাঢ় হয়ে থাকা. . . ”

বাঁকের মুখেই ছোট্ট ভাঙাচোরা ছাউনি- - - । লাল টুকটুকে বলিরেখাময় গালের বৃদ্ধার হাতে চায়ের ফ্লাস্ক আর বিশাল চেহারার দুটো পাহাড়ি কুকুর। গোলাপি জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে। অনেকটা নিচে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের ঘর- - - বসতি। সেখানে তেরচা রৌদ্র। আর এই ওপরে বৃষ্টি। কি আশ্চর্য! এ দুইই একসাথে সত্যি। এই রডোডেনড্রনের মাথার ওপর রোদের ফোঁটায় জাপটে ধরা মেঘ ঝরিয়ে দিচ্ছে অশ্রুফোঁটা যা হাওয়ার আঙ্গুল যত্নে মুছে নিচ্ছে ছুঁয়ে ফেলার আগেই। শিরার মধ্যে দিয়ে নেমে যাওয়া লোণা তরল ড্রপ ড্রপ ড্রপ- - - -

“দল বা মন্ডল মানে
যূথবদ্ধ পরাগে, উৎসবে
লেবংবস্তির ধার ঘেঁষে আবার কখনো
ধোঁয়ার উচ্ছ্বাস
ফোঁটাদের ছলছল
অনেকটা মেঘ ডেকে উঠে
তোমারই আলাপ যেন, তোমারই বিস্তার”

বাঁশি বাজছে কোথাও। নানা জ্যামিতিক স্থাপত্যে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে নামছে দ্যাখো পায়ের কাছাকাছি। যেখান থেকে কুড়িয়ে তুলছি লালনীল ডাকটিকিট। ঠিকানাবিহীন রঙিন চিঠির নৌকো ভাসতে ভাসতে ওই পাহাড়চুড়োর দিকে। বিপজ্জনক খাদের মুখে দাঁড়ানো শিখছি। আজকাল আর মাথা ঘুরছেনা...অনেকটা নিচে তাকালেও না। ও- - - ই খাদের ভেতর নুড়ি হয়ে শুয়ে থাকার সম্ভাবনাতেও না। হঠাৎ রোদের ঝলকানিতে উৎসব উৎসব- - - তবু একলা হয়ে যাচ্ছি। অ্যানাস্থেসিয়ার ঘূর্ণির মধ্যে যেমন। চাইলেও পাচ্ছিলাম না স্পর্শে তোমার উষ্ণতা- - - -

“পাকদণ্ডীর ভাঁজে যে ঝুঁকিপ্রবণতা
তারও কিনার ছুঁয়ে
একা গাছ
কিছু গাছ যেরকম থেকে যেতে চায়”

বিসর্জনের রাস্তা বদলিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো পথ। সেখানে আলোখই আর পাখিদের সংকীর্তন। লাঠির ডগায় পৃথিবী নাচানোর কায়দা শিখে কিরকম সেয়ানা হয়ে উঠেছি- - - এইসব সাতকাহন ভেবে হা হা হেসে উঠি। দ্যাখো বর্মবিহীন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছি- - - সামান্য ক্ষতচিহ্ন ছাড়া অন্যান্য অভিজ্ঞান

ছেড়ে রেখে যাব এই পাহাড়তলির ঘুমে। মাথা পেতে গ্রহণ করছি এই কুয়াশা পতন, বৃষ্টিছাঁট। পোষমানা চতুস্পদের পিছু পিছু রথ নিয়ে ছুটিনি কোনদিন— জানো তুমি। তাই অবিশ্রান্ত ভিজে যাওয়া গুলো চোখের জল লুকিয়ে রাখে। খোঁড়ার ভূমিকায় হেঁটে হেঁটে আজকাল আপনাকে খুব মনে পড়ে, প্রিয় চ্যাপলিন- - -

“এই বৃষ্টির ভেতর বাঁক নিচ্ছে কাঠের রেলিং
হাতমোজার কেঁপে ওঠা থেকে
সাদা হয়ে আসা চিবুক
শিকারি কুকুর, বশ্যতাপ্রিয় ঘোড়া
উড়ে যাওয়া ছাতা
মাথা বাঁচানোর কৌশল না জেনে
একআধটা খোঁড়া পর্যটক
কুয়াশা হয়ে উঠছে, বেমালুম”

যে আলোর দিকে যাবো বলেই এতপথ, এত উঁচুনিচু, এত কাঁটা ফুটে থাকা রক্তছাপ ,তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এক ফোঁটা করে চরণচিহ্ন দিয়ে যাচ্ছে আমার পঙ্গুত্ব, জড় থেকে জীব হয়ে ওঠা। পশমি রুমাল আতরদানের আলতো আদর সাজিয়ে রাখা তুলো গজ আর না ভিজতে পারা নাছোড় দুপুর গড়িয়ে গোপনে, আর শ্রবণ কিরকম মেঘমল্লার, কিরকম অপরিসীম স্তব্ধতার নুড়ি কুড়োনো হালকা ওম পেঁচিয়ে নিয়ে শুয়ে আছে আদরের কাছাকাছি...একে তুমি বিষাদ বোলোনা, বোলোনা দুঃখ বিলাস। ছুরি- কাঁচি এনাস্থেসিয়ার আবহ সরিয়ে ওই শ্রাবণ নামছে, আর সমস্ত রাস্তা কিরকম পাকদন্ডি বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছে, পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে ক্ষতমুখ...ব্যথা নেই আর জোড়াতালি নেই, অসাড়ত্ব নেই ....আলো শুধু ফুটে আছে, কুসুমবিলাসী।

“ওই নিশানের নীল বা হলুদ
গড়িয়ে আসবে বলে
সূর্যোদয়ের মুখ
তোমার সাথে অদলবদল
উষ্ণতা ভেদ করতে করতে
মাটির উল্টো দিকে ভেসে উঠি দ্রুত”

আজ চৈত্র সংক্রান্তি। ১৪ই এপ্রিল। এরকমই একটা চৈত্রের কথা ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের দিকে বিস্তারিত অবিকল ডানা, সংক্রান্তির দরজা পর্যন্ত। তার পরেই পাশাপাশি কালো জল, দোলনা সিঁড়িরা, বুড়ি মাছ, নোলকের বিচ্ছুরণ থেকে রোদ, অস্পৃশ্য ছায়াদের কথা- - এসবকেই খুব নিচু স্বরে বলে যাচ্ছি- - - পিছনে ডেকোনা, কিছুক্ষণ থাকো। বোবা ও অন্ধ থাকি এসো, চুম্বনে যেরকম। ফুরিয়ে যাচ্ছে যে মুহূর্তের অন্তরঙ্গগুলো- - - তাকে ছুঁয়ে দৃষ্টিবিভ্রম,

তাপের বিভাব খুলে উপসংহার। একেকটা গড়ানো থেকে, ঢালু থেকে পথ ঘুরে ঘুরে পায়ের তফাতে, উৎসবে, কোমর দুলিয়ে ওঠা। আমাদের সারিগান যতদূর লেখা হয়ে থাকে, তুমি তার দুপুরের প্রকৃত স্বভাবে লীণতাপ- - চোখে রাখো, আহা তীব্র চোখ। কান পেতে শুনছি ফিরে আসা পায়ের শব্দ। তোমার ভেতরে তুমি হয়ে আছি...মিশে যাচ্ছি কুয়াশায়—হাঁটা শেখার স্কুল থেকে রঙ পেন্সিল ইজেল আর প্যালেটের অগোছালো কুড়োতে কুড়োতে দেখছি ওই ঢালু বেয়ে নেমে যাচ্ছে হুইলচেয়ার- - - -

“পশমিনার আড়ালে
কেঁপে ওঠা পাঁজর, নিজস্ব উপত্যকা
সুগন্ধি হয়ে থাকায়
এরকমই আলো ও ছায়ারা, যুগপৎ
সতর্ক মঞ্জরী গুছিয়ে রেখেছে
স্পর্শাতীতে, চোখের আড়ালে

গভীর অবধি ছড়িয়ে যাচ্ছ
ওষুধের ঝাঁঝালো মুছে
এই রাস্তা, খাদের কিনার
নির্জন হয়ে থাকা স্মৃতিপথ
শেষমেশ উজাড় করেছ
গাঢ় জলের চিহ্ন বলে যাচ্ছে—
এখানে নদীরা ছিলো, কোনওদিন”

স্বকাব্যকথন

ডিম ভাঙা বাচ্চাটি
রঞ্জন মৈত্র

আরক

আলো ঢালবার শব্দ গ্লাসে গ্লাসে
একটা দুটো গানও কি দেয়াল ঘড়িতে
চিড় ধরা পাহাড় জোড়াই
আর ঘন জানলার বানে ভেসে যায় সবুজ দেয়াল
ডিম ভাঙা বাচ্চাটি ঘুরে দেখছে ভাঙা ডিমকেই
চারপাশে পিকেটিং পিকেটুং উদয় খিলোনা
তৈরি পালকের দিকে ছিম কফিতাপ
চুমুর তৎসমগুলো ছুঁয়ে আর মূক লাগছে না
অনুবাদকের ভোরে ক্যামেরা ভুলতেই
অচুক পা হয়ে পড়ল সোনালী তরল
সাদা গেলাসের দেশে হিব্রু হাসিনা

নাহ, সন তারিখ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কথা হল বারীনদা, স্বপন, রাজর্ষি আর স্বপনের অগ্রজ বন্ধু তুষারবাবুর সঙ্গে আমিও যাবো সিকিমের ভার্সে । রডোডেন্ড্রনের মেলায়, গুরাশ কুঞ্জে, উদ্ধত শিখরদের আশেপাশে। এসব ছিল আমাদের কবিতার ট্রেকিং । বাধাবন্ধনহীন অসীমের কাছে দাঁড়িয়ে নিজেদের মুক্তি খোঁজা, কবিতারও । নেচার- রাইটিং তছনছ করা সেই আমাদের আপন কবিতা- প্রকৃতির রিরাইটিং, আবিষ্কার, ভাঙচুর এবং মূলত নতুনের অভিযাত্রা । চারপাশের পন্ডিতি, বানানো বিদ্রোহ, গোপনে- মারাত্মক- খ্যাতিলোভী ও ক্ষমতালোভী নকল কামাল পাশাদের লাফালাফি এবং উত্তরাধিকার ভাঙানো নকলস্য নকল কবিতার মেডেল- নিনাদ, ঢুলুঢুলু চোখ, খুলুখুলু পাজামা, কষে ফেনা, চোখে পিঁচুটি, চিরন্তন কবির এইসব হক্কের জার্সিতে লাথি মেরে ন্যাংটো হয়ে ঘাম ঝরাতে চেয়েছিলাম আমরা । জড়তা ঝরাতে । পায়ের মাসলগুলোকেও কবির ন্যাকামি, জিন্দাবাদ ও বিদ্যেধর ইন্টেলেক্ট থেকে মুক্তি দিতে। তো এসব হল সপক্ষে ভাষণ । মাইকানো । আসল কাহিনী হল সেই আমাদের পূর্বপরিকল্পিত ভার্সে যাওয়ার ঠিক দুদিন আগে, বিকেলবেলা, দুই হাতে দুই ভারী ব্যাগ নিয়ে আমি, খামোখা, চালু হয়ে যাওয়া ট্রেনের সামনে দিয়ে দ্রুত পেরিয়ে যেতে গিয়ে নুড়িতে হড়কে পায়ের পাতায় উল্লেখযোগ্য চিড় ধরিয়ে বসলাম । কাটা পড়িনি । পাড়ার ডাক্তারকে বললাম, যে, কিচ্ছু জানি না, পরশু আমার রওয়ানা, সেই মতো যা করার করুন। তিনি সব দেখে এক অরথোপেডিকের কাছে রেফার করে, মৃদু হেঁসে বললেন, যান ডাক্তার অমুকের কাছে ঘুরে আসুন, তারপর দেখছি । এবং সেই অরথো- ই অনর্থের মূল হয়ে পড়লে আমি রাত করে বাড়ি ফিরি পায়ে প্লাস্টার সমেত।

তো, বোধহয় দিন চারেক পরের সন্ধ্যেয়, ঘরে, নিজের ওপর একরাশ রাগ ঘৃণা নিয়ে বসে প্লাস্টারে খুজলি করছি, আচমকা মনে হল আজ তো

বারীনদারা সোমবারিয়ায় । কোনও কোনও জায়গা নামেই মাত করে দেয়, টানতে থাকে নিজের দিকে। যেমন ঝুমরিতিলাইয়া । যেমন সোমবারিয়া । ভীষণ ভীষণ মন খারাপ করল । প্রায় দেখতে পেলাম বারীনদা- স্বপন- রাজুদের গুছিয়ে জমিয়ে গোল হয়ে বসা মুখগুলো, কবিতার খাতা, তুঙ্গ আলোচনা আর খালি গ্লাসগুলোকেও । একটা হাত সোনালী তরল ঢালছে পরপর গ্লাসে। তার মৃদু শব্দ। শুনতে পেলাম। অসম্ভব মন খারাপ থেকে প্রায় হাসিমুখে বেরিয়ে এল প্রথম লাইনটি। আলো ঢালবার শব্দ গ্লাসে গ্লাসে । কাচের গ্লাসের পরিচিত এবং স্বীকৃত সীমা থেকে ওই আলোরব ছড়িয়ে পড়বে মাথায় হাতায় কুয়াশায় হিমেল আবহে। ট্রেকিং- এর শব্দ ছাপিয়ে আমরা আবিষ্কার করব সেই ধ্বনি । মনখারাপ কেটে গেল এক ঝটকায় । দরকার পড়ল সময়টাকেও মিউজিকালি ঘড়ি থেকে বার করে আনার । এরপর চুপ করে বসে থাকি। নিজেদের কাজকর্ম এবং উদ্দেশ্যের কথা ভাবি। শুধু বিনির্মাণের কোনরকম মান বা গরিমা ছিল না আমাদের কাছে। যে বিনির্মাণ পরবর্তী নির্মাণের দিকে নিয়ে যায় না তা আমাদের ছিল না। অচলায়তন ভাঙার পরবর্তী নির্মাণই মনে পড়ল। চলার কথা । পায়ের হাড়ে যে চিড় তাতে জোড়াই- এর মালমসলা দিলাম মনে মনে। ফলে কত জানলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । আর ভেসে গেল দেয়াল হয়ে ওঠা প্রকৃতি । তুফানি ট্রেনের জানলা থেকে তাকালে দূরের সবুজ পাহাড় বন জলাশয় কেমন স্থিরচিত্রের মতো লাগে আর হাতের কাছের গুলি দ্রুত দৌড়তে থাকে উল্টোমুখে । একবার ক্যামেরায় পেয়েছিলাম সেই ছবি। দূরে সব স্থির আর জানলার গায়ের ঝোপে জঙ্গলে যেন সাইক্লোন বয়ে গিয়েছে । সৃষ্টির কথা মনে হয়েছিল । প্রথমে হালকা লালচে ডিমটিই যেন সাদা চূড়ায় । তারপর ডিম ফুটে সূর্য বেরিয়ে পড়ে। ধীরে হলুদ তরল দিগন্ত ছড়ানো । যখন শূন্য থেকে সূর্য ঘুরে দেখছে ওই ভাঙা পূর্বাশ্রমটিকেই । সেই আবিষ্কার সেই ছড়িয়ে পড়ার তাপ লাগছে আমাদের নতুনের দিকে উড়াল দেওয়া পালকে। কফির বেশে আসা সেই উত্তাপ। অন্যকোনো পরিভাষাও হতে পারত। ফলে সানরাইজ নামক আবেগটি তখন একটি অপ্রয়োজনীয় খেলনা ছাড়া কিছুই নয়। চুমুকও তো চুমু দিয়েই শুরু। নতুন আলো খুঁজে পাওয়ার আনন্দে আর হতভম্ব লাগলো না তার উত্তাপে ঠোঁট লিখে দিতে । ক্যামেরা বেকার হয়ে গেল। কোন এক ভোরের উদয়শিখরে ক্যামেরা ভুলে প্যাঁক খাওয়ার স্মৃতি ফিরে এল অপরিসীম আনন্দ হয়ে । কারণ সব ছবি তুলতে নেই । কারণ পা তো ভুল করে নি। সে অজানায় পা ফেলেছে নির্দ্বিধায় আর হয়ে পড়েছে সেই সোনালী তরল যা গ্লাসে ঢাললে আলোর ধ্বনি হয়। যা পোক্ত কাচে ঘেরা নন্দিত বন্দিত কবিতা- মোকাম নড়িয়ে দেওয়া এক বিস্ময়- সুন্দরী হয়ে ওঠে । আ- রক নেচারকে তরল করে আনা সেইসব মুহূর্ত মন জুড়ে এল। অনেক পরে বারীনদা সেই ভ্রমণের হাওয়া লাগা একটা কবিতায় লিখল "ভার্সে ভার পায়ে"। এখানে একটু মজা আছে। আমরা যখন হাঁটি, প্রতি পদক্ষেপে একটা পা শরীরের ভার- কে রক্ষা করে, ধারণ করে। বাংরেজিতে বলা যায় ভার- সেভার- পা। বারীনদা সেটাকে এক টুইস্টে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল । পড়তে পড়তে টের পেয়েছিলাম যে সেদিন আমার মন থেকে ভার্সে না যেতে পারার খুব খুব কষ্ট, ভার্সে(র) ভার কেটে গিয়েছিল, ঘুরে ওই ভাঙা ডিমটিকে দেখতে চাওয়ার আনন্দে।

স্বকাব্যকথন

কবিতা নির্মাণের দু চারিটি অভিজ্ঞতা
যশোধরা রায়চৌধুরী

একদিন গল্পের শুরু । তোমার একাকী সন্ধে তখন সামান্য সিরিয়ালে
মজে আছে। এমন সময়ে
ঘরে ঢুকল পর্দা সরিয়ে
অন্ধকার মুখচ্ছবি, কালো জার্সি, শক্ত, পেশল
অব্যর্থ পুরুষ, যার অতর্কিত ফাঁস
তোমার গলায় বসল – আর তুমি উঠে পড়লে কি জানি কি ভেবে
সোফা থেকে – সাঁৎ করে সে- ও সরে গেল
বারন্দায় বয়ে গেল এলোমেলো হাওয়ার ঝলক
তুমি গেলে রান্নাঘরে- হাত যায় অন্বেষণে – ফ্রিজে
টিংগোর চুইং গাম, ডার্ক চকোলেট
লুকিয়ে আস্বাদ করলে – টিংগো গেছে টিউশনে, শমিতও ফিরবে না
অফিসের চাপ খুব মার্চ মাসে – কৃষ্ণসন্ধ্যায়
তুমি আজ পুরোপুরি একা ও স্বাধীন
কফি খাও উঁচু মগে, টিভি দেখো, চুল আঁচড়াও
ধীরে ধীরে ঢুকে যাও আস্বাদনের ঘোর জালে …
সঙ্গে থাকে অপর পুরুষ
সঙ্গে থাকে অদৃশ্যশরীর সেই কালো ছায়া, পেছনে পেছনে
ফলো করে, হেঁটে আসে একেবারে বিছানা অবধি
ওরই তুমি ক্রীতদাসী, আকাংক্ষাশ্রমিক
ও তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অঙ্গুলিহেলনে
আয়নার সামনে যাও, ক্লিপ আটকাও আর টাইট পোশাক পরো, সাজো
ও তোমার সঙ্গে আছে … ফিসফিস করে বলছে, বাজো, মেয়ে, বাজো
রিংটোনে, ডুবে যাও ডানলোপিলোছলে
হালকাফুলকা এস এম এসে, তারপর গড়িয়ে যাও গ্লসি পত্রিকায়
বসন্তের সেল থেকে নতুন নতুন জামা পরো আর
স্তন ভরো উঁচু উঁচু ব্রা- এর খাঁচায়
ধুকুপুকু পুষে রাখো বুকে, যেন পাখিটি, গোপন
এখন তো ওরা নেই, এই ফাঁকে ডেটিং- এ যাবে না ?

শীতল স্যুদির ঠোঁটে আমূল চুমুক দিয়ে স্ট্র দাঁতে কাটবে না ?
সে তোমার মেগাকৃষ্ণ, সে তোমার আসল, আপন
সে তোমার একমাত্র প্রেমিক, অশরীরী
গল্পের শুরুটা এই- ই । পরবর্তী এপিসোডে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে
নিজের পোষাক করে পরে নিচ্ছে তোমার শরীরই !

(অপর পুরুষ)

এই কবিতাটি ২০১০ সালে অর্থাৎ বাংলা ১৪১৭- র শারদ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে আমি অন্তত ৬- ৭ বার লিখেছি। এতবার বোধ হয় আমার কোন কবিতাই মাজা ঘষা নাড়া ঘাঁটা হয়নি। সেদিক থেকে এই কবিতাটি উল্লেখনীয় ।

এতবার বদলানোর ইতিহাস আমার কবিতায় বেশি নেই। একে তো আমার স্বভাবকবি বদনাম আজো ঘোচেনি । হড় হড় করে কবিতা লিখে যাই আমি, এমনটা অনেকেরই ধারণা। ডানদিক বাঁদিকে না তাকিয়ে কবিতা লিখে যাই।

তাছাড়া, লেখার স্বতঃস্ফূর্ততায় আমি নিজেও বিশ্বাসী, এবং ভেতরের চার্জ বা তাগিদঘটিত যে যে ক্রিয়া চললে লাইনের পর লাইন নিজের থেকে আবির্ভূত হয় কবির কাছে, তার উপরে আমার বিশ্বাস অপরিসীম। অপ্রত্যাশিত শব্দবন্ধ, সত্যের নানা অভূতপূর্ব ঝলক আমরা দেখতে পেয়ে যাই সেইসব আত্মবলিদান থেকে। নিজের লস অফ কনশাসনেস থেকে। পরবর্তীকালে সচেতনে সেইসব লাইনকে কাটাকুটি করে চলা, সে নির্মাণের আর একটা পর্ব।

তবু, বদনাম থাক আর নাই থাক, প্রতিটি স্বতঃস্ফূর্ত লেখনই যে কবিতা হয়ে ওঠে না সে কথা আমার থেকে বেশি আর কেই বা জানে ? মাজাঘষা করতে করতেই ডায়েরিতে, ‘এমনি’’ লিখে ফেলে রাখা লাইনগুলির আকরিক হীরকের দ্যুতি পেয়ে যেতেই পারে, একথা সব কবির জানা। শিল্প তখনই আমরা বলি তাকে, যখন এইসব ঘষামাজা পেরিয়ে লেখাটি রসোত্তীর্ণ হয়।

এ তো সবই তাত্ত্বিক কথা। এ থেকে কোন বিশেষ কবিতার মধ্যে প্রবেশ করা যায়না। কারণ প্রতিটি কবিতাই একটি পৃথক যাত্রা। প্রতিটি কবিতার শরীর একটু একটু করেই গড়ে ওঠে সাদা কাগজের উপরে, তার বাইরের অনেক তথ্য, অনেক ইতিহাস অদৃশ্যভাবে সম্বলিত থেকে যায় ইন্টার টেক্সচুয়ালিটি হয়ে, লেখালেখি সংক্রান্ত রাজনীতি হয়ে ।

এইসব ভেজাল গৌরচন্দ্রিকার একটাই কারণ । এই কবিতাটির ইতিহাস বর্ণনা । এই কবিতাটির প্রথম ড্রাফট হয়েছিল ২০০২ সালে । অনেকদিন এটি এর দৈর্ঘ্য এবং বিষয়গত নানা সম্ভাবনা সত্ত্বেও, ঠিকঠাক কবিতা হয়ে উঠতে না পারার কারণে পড়ে ছিল ডায়েরিতে, ফার্স্ট ড্রাফট হিসেবেই।

তখন আমি রাঁচিতে থাকি। আমার চাকরিসূত্রে বাইরে যাওয়া, অনেক চাপ সেই চাকরিতে। মেয়ে ২ বছর বয়সি, ইস্কুলে যেতে শুরু করেনি। তাকে নিয়েও জোর করে বদলি হয়েছি। তার দাবি আমার সময়ের উপরে তখন সর্বাধিক, অফিসের পরেই। আমার বর তখন কলকাতায়, কাজেই বিরহদশায় প্রচুর কমিউনিকেশন গ্যাপ চলেছে, মাঝে মাঝেই অসহ্য হয়ে ওঠে এই ফোন- দাম্পত্য। আমার শাশুড়ি বাধ্য হয়েছেন আমার মেয়েকে দেখার জন্য রাঁচিতে গিয়ে থাকতে, তাতেও বিস্তর অসুবিধে দু পক্ষের, যদিও কেউই সেকথা বলছি না। সব মিলিয়ে একটা কেমন অনিয়ন্ত্রিত খারাপ লাগা জমে উঠেছে। কলকাতার লেখালেখির পরিমন্ডল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াজনিত খারাপলাগা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, লেখালেখিকেই ধরেছুঁয়ে না থাকার কষ্ট, ইত্যাদি এরই সঙ্গে ছিল, তবু একেবারেই যে কিছু লিখছিলাম না, তা- ও তো নয়। কিন্তু কেন যেন এই কবিতাটা ফার্স্ট ড্রাফট হয়েই পড়ে ছিল, এগোয় নি আর।

ফাঁকা ফাঁকা একটি পাড়ায়, গাছপালা ঘেরা নিরিবিলি স্টীল অথরিটির কলোনির ভেতরে আমরা তখন থাকি। সন্ধে হলেই চরাচর ঢেকে যায় অন্ধকারে, বাংলোর চারিপাশে ছোট বাগান ও লন ভরে ওঠে কুয়াশাচ্ছন্নতায়। ঘরের মধ্যে আমরা পরিবারের শুধুমাত্র মহিলাসদস্য, শাশুড়িমা, আমি, মেয়ে ও কাজের মেয়েটি, দরজা জানালা এঁটে বসে থাকি টিভি চালিয়ে। সন্ধ্যা নাবার পর কোন ক্রিয়াকর্ম নেই। বাজার- হাট যাওয়া হয়না । সিনেমা থিয়েটারও নেই। সুতরাং পালাবার পথ টিভি। আমার মনে আছে, সন্ধেবেলা রোজ নিয়ম করে ‘রোজগেরে গিন্নি’ আর ‘এক আকাশের নিচে’ দেখা হত। জি বাংলা আর ইটিভি দুটোই পাওয়া যেত আমাদের কেবলে। মনে আছে, এই কবিতাটি লেখার সময়ে, এক আকাশের নিচে থেকে শুরু করে আরো অনেক টিভি সিরিয়ালের ভেতরে অনেক অনেক নারীচরিত্রের লড়াই- আবেগ- সক্ষমতা- অক্ষমতার মিডিয়াচর্চিত নতুন ট্রেন্ড দেখছিলাম, সচেতনে বুঝে নিতে চাইছিলাম আমার পরিপার্শ্বের মেয়েদের কথা। দেবলীনা কনীনিকা সমতা চৈতি ঘোষাল- দের মুখ দিয়ে যাদের আঁকা হয়, সেই সব বিবাহিতা, ডিজাইনার তাঁতের শাড়ি পরিহিতা, জীবনের নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ, অতি বাস্তব কিন্তু অবাস্তব স্টিরিওটাইপ সব মহিলাচরিত্রের ভিড়ে, টিভি- নারীদের ভিড়ে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম একটা চেনা প্যাটার্ন। জীবনের সাফল্য আর অসাফল্যর নিরিখগুলো যাদের দ্রুত পালটে যাচ্ছে। যারা বেশি বেশি করে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন। স্বামী বা সন্তানকে বাদ দিয়েও যাদের কামনার বস্তু হয়ে উঠছে অন্য অনেক কিছু। আর সমাজ তাদের সেই অনুমোদনও কোথায় যেন দিয়ে দিচ্ছে, নিজের জন্য বাঁচো, নিজেকে সুখ দাও, নিজের মত করে আনন্দ পাও। আবার, চেহারা বা ফ্যাশনেও যারা ক্রমশ একই ছাঁচের হয়ে উঠতে চাইছে। একই রকম জামাকাপড় পরতে চাইছে, একই রকম করে চুল কাটতে চাইছে। একই রকম করে চুলে ক্লিপ আটকাচ্ছে।

হঠাত একদিন লক্ষ্য করলাম, আমি নিজে যে রকম চুলের ক্লিপ আগে লাগাতাম সেইরকম আর লাগাচ্ছি না। আমার চুলে উঠে এসেছে পুরনো ধাঁচের ক্লিপের বদলে বাজারে নতুন বেরনো এমন একটা ক্লাচ, দাঁতনখ বার করা, কাঁটা কাঁটা একরকমের ক্লিপ, যা ছোট করে কাটা চুলের অবাধ্য গোছাকে যে কোন মুহূর্তে হাত দিয়ে মুচড়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে গুটিয়ে একটা খোঁপার মত করে তাতে লাগিয়ে ফেলা যায় মুহূর্তের মধ্যে, আয়না- চিরুণি কিছুই লাগে না। এই যে চটজলদি সমাধানের মত জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গে পালটানো চুল- ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাটি, এটা কোথায় থেকে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল আমাদের মেয়েজীবনে। আমাদের চাকরি, পরিবার, স্বামী সন্তান ম্যানেজ করার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে চুল ম্যানেজ করার সমস্যাও তো একটা ব্যাপার। সেই একটা অন্তত সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করে দিচ্ছিল ওই উঁচু চূড়ো করে চুল বাঁধার ক্লিপ বা ক্লাচ। যা বাঁধতে গেলে প্রথমত চুলটাকে ঘাড় অব্দি হতে হয়, বেশ খানিকটা ছোট, আর চুলে শ্যাম্পু করাও বাধ্যতামূলক।

তো নিজের কিছু কিছু অভ্যাস এইভাবে পাল্টাতে দেখেছি ঈষত অন্যমনস্কভাবেই। হঠাত একদিন লক্ষ্য করলাম ঐসব সিরিয়ালের নায়িকারাও একই রকম ক্লাচ ব্যবহার করে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল যেন আমার। তারপর দেখি, হিন্দি ছবির নতুন নতুন হিরোইনরা, সেই সময়ের প্রিটি জিন্টা বা মল্লিকা শেরাওয়াতরাও ওই রকম ক্লাচ দিয়ে চুল বাঁধে। শেষ পেরেক আমার কফিনে পড়ল, যখন দেখলাম স্টার মুভিজ- এর কোন এক হলিউডি ছবিতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলিও কথা বলতে বলতে নিজের লঘু বাদামি- সোনালি চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে পেছনে মুড়িয়ে ঠিক সেই ভঙ্গিতেই ক্লাচ আটকালো, যেমনটা ইদানীং আমি করি।

কেঁপে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে বুঝতে পারলাম, আমার প্রতিটি জেশ্চার, শরীরের প্রতিটি ভঙ্গিমা, প্রতিটি অভ্যাস আসলে কোন না কোন সূত্র থেকে কপি করা। তারপর থেকে সত্তর দশকের মেয়েদের সকলের চেহারার প্রতিসাম্য, ষাট বা আশির দশকের… সব দেখি, লক্ষ্য করি। যে কোন পুরনো সিনেমায় নায়িকার হাবভাব দেখি, আর বুঝি , সেই সময়ের প্রতিটি মেয়ের মধ্যে বয়ে গেছে সেই একই অদৃশ্য কানুনের ঢেউ, একই রকম আচার বিচার অভ্যাস । পঞ্চাশের দশকের সুচিত্রা সেন –এর টাইট সিল্ক ব্লাউজ আমার মায়ের কৈশোরের বা বিয়ের আগে পরের সাদাকালো ছবির সঙ্গে কী দারুণ মিলে গেছে। সত্তরের পিকনিক ছবির নায়িকা আরতি ভট্টাচার্যর ভয়েলের ছাপা শাড়ি আর দীর্ঘ চুল দেখে আমার অবধারিত মনে পড়ে আমার ন'মামিকে, ছোটপিশিকে। আমার শৈশবে দেখা অন্য ক্যারেকটারদের। এ ভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সময় আমাদের ফ্যাশনকে, জীবনচর্যাকে, আমাদের ব্যবহারকে অভ্যাসকে কী ভাবে আড়াল থেকে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে প্রভাবিত করেছে। কী ভয়াল তার অঙ্গুলিহেলন। আমরা তার ক্রীড়ণক, তার দাসী।

এই সময়ের প্রেক্ষিতেই এবার আমি ভাল করে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় রেখে দেখি, আমার সময় আমাকে, আমার চারিপাশের আর সব মেয়েদের, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। আশে পাশে ২০০০ থেকে গজিয়ে ওঠা বড় বড় শপিং মল, তাদের রেডিমেড পোষাকের রেঞ্জ নিয়ে এসে আমাদের অনায়াসে বলে দিচ্ছে কী পরতে হবে কেমন ভাবে পরতে হবে। আর আমাদের সময়ের চিন্তার আবহ আরো বেশি আড়াল থেকে আমাদের বলে দিচ্ছে, কী বিশ্বাস করতে হবে। কী স্বপ্ন দেখতে হবে। কীভাবে আকাংক্ষা করতে হবে। কাকে আকাংক্ষা করতে হবে। কতটা ভাল থাকতে হবে। কতটা খারাপ থাকতে হবে। আমরাও আকাংক্ষাশ্রমিক হয়ে উঠছি।

এইসব লিখতে গিয়েছিলাম সেই ডায়েরির প্রথম ড্রাফটে, পারিনি। রেখে দিয়েছিলাম। তারপর আর কয়েক বছর কেটে গেল। ২০০৯- এর কোন এক সময়ে আমি যখন গৌহাটিতে, তখন কবিতাটি আবার বার করি। আবার মাজাঘষা শুরু হয়। একা একা কফি খাচ্ছে একটি বিবাহিতা মেয়ে, আমার ফার্স্ট ড্রাফটে এই ছবিটাকেই খুব ক্যাচি, সেক্সি, চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া নানা জায়গায় এমন সব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল যা থেকে আমার মনে হয়েছিল এই লিখে ফেলা লাইনগুলির কবিতাসম্ভাবনা আছে।

ঘষামাজার সময়ে আমি যে লেখাটি দাঁড় করিয়েছিলাম, তাতে ‘‘সময়’’ এই শব্দটা, লক্ষ্যণীয়, বার বার এসেছিল, যাকে, আমি, আমার মতে, আমাদের সর্বপ্রধান প্রেমিক/নিয়ন্ত্রক/ক্ষমতাময় চালক ভেবে কবিতাটি প্রথমবার ড্রাফট করি।

স্বকাব্যকথন

খোলা পাতা, আত্মহনন

ধীমান চক্রবর্তী

প্রায় পঁচিশ বছর হতে চললো। এখন আর এসব নিয়ে বিশেষ কিছু। ১৯৯১। তার এক- দেড় বছর আগে প্রথম বই "আগুনের আরামকেদারা"। অল্প- বিস্তর কবিতা লিখি। এখানে- ওখানে। পাশের পাড়ার ছেলে মহারাজ। বন্ধু না হলেও ছোটোখাটো আড্ডা, পরিচয়। বইটার প্রথম কবিতা ছিল "দড়ি", তারপর "বিষণ্নতা"। দু'চারটে আসরে কবিতা পড়তে যাই। ডাকে। সেখানে কেউ কেউ উপরের দু'টো কবিতা শুনতে চায়। বিশেষত দড়ি কবিতাটা। কোনভাবে তা মহারাজ পর্যন্ত। ও পড়তে চায়। ওকে কবিতার বইটা দিই। কিছুদিন বাদে রাস্তায় দেখা। তোমার কবিতার বইটা পড়ছি। ও জানায়।

দড়ি

আত্মহত্যার ঘটনা যেভাবে বেড়ে গেছে, তাতে বোঝা যায়
দড়িকে আর কেউ সাপ ব'লে ভুল করে না। কিন্তু কেউ কেউ
মালা ভেবে রজনীগন্ধা কিম্বা গোলাপের গন্ধ পায় নিশ্চিত।
ব্যাপারটা এভাবে ঘটে - যারা টেবিল চেয়ারে বসে অফিসের
কাজ করে তারা লেজার আর ফাইল দেখে দেখে ক্লান্ত হয়,
যথেষ্ট ক্লান্ত হ'লে মৃত্যুর কথা ভাবে, মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে
একদিন ঘরে টাঙানো কাপড় শুকানোর দড়ি দেখে হঠাৎই
আত্মহত্যার কথা মনে হয়। আমি কয়েকজনকে প্রশ্ন ক'রে জেনেছি,
ট্রাম বা বাসের ঘণ্টার দড়ি দেখে তাদের এরকমই হয়েছে।
অন্যেরা মৃত মানুষের খুলি গোণে, গুণতে গুণতে ক্লান্ত হয়। মৃত্যুর
কথা ভাবে এবং সায়ার দড়ি, ওয়েটারের বেল্ট এবং ঘোড়ার লেজ
দেখে আত্মহত্যার চিন্তা পেয়ে বসে তাদের। আমাদের সামনে
জোছনার মতো কিলবিল করে আত্মহত্যার দড়ি। তারপর

প্রত্যেক বছর একবার ক'রে বর্ষা হয়, দড়িতে শ্যাওলা পড়ে

পরের বছর গতবারের মতো বর্ষা হয়, দড়িতে শ্যাওলা পড়ে
সেই বছর সেই বছরের মতোই বর্ষা হয়, দড়িতে শ্যাওলা পড়ে

আত্মহত্যার মতো একটুকরো দড়িও থাকে না, সব পচে যায়।

কিছুদিন পর। সকাল। বাজারে যাচ্ছি। তেরচা রোদ। যেখানে পড়ছে - আলো। বাকিটা আবছা। আড্ডা মারছিল মহারাজ বন্ধুদের সঙ্গে। আমাকে দেখে হনহন করে এগিয়ে। তারপর চার্জ। কি সব কবিতা লেখো ? জানো কয়েকদিন আগে অমুকে গলায় দড়ি দিয়েছে। তোমার "দড়ি" কবিতাটা পড়ে । ওকে বইটা পড়তে দিয়েছিলাম। ঝুলন্ত দেহটার পাশে টেবিলে তোমার বইয়ের "দড়ি" কবিতার পাতাটা খোলা ছিল। কি সব যে লেখো ! বলে আবার হনহন করে সামনে।

আমি অবাক। হতবাক। স্তব্ধ। বিদ্ধস্ত। প্রশ্নটা আর করে উঠতে পারিনি। আমারি কবিতা পড়ে ? তুমি জানলে কি করে ? মনখারাপ, দুঃখ সেদিন। সারারাত। ঘুম না না- ঘুম। এসবের জন্যই কি হেঁটে চলেছি বা সারারাত নির্ঘুম। কি যে হয়ে গেল ! বাড়ি নিঃঝুম। পাশে সবাই ঘুমাচ্ছে। শুধু আমি একা। সম্পূর্ণ একা। আকাশে প্রায় পুরো চাঁদ, সন্ধে বেলা। নিশ্চই রাত্রেও। তবে এতো অন্ধকার কেনো !

পরের দিন বিকেল। রকে আমি আর শিল্টু। সব শুনে বললো, ধুস্ কবিতা পড়ে এসব হয় নাকী ? ফালতু। ওকে নিশ্চই নিশিতে পেয়েছিল। কিম্বা পেঁচো ঠাকুর ডেকে নিয়েছে। ও আবার একটু ধর্মে- টর্মেও। ভয়ে ভয়ে বললাম, পেঁচো ? সেকিরে জানিস না। খুব জাগ্রত। বৌবাজারে মন্দির আছে। পঞ্চানন্দ ঠাকুর। সত্যিই কত কিই তো জানি না।

কয়েকদিন পর। ফুটবল খেলে ফিরছি। সন্ধে হয় হয়। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল কীনা মনে নেই। সঙ্গে শেখর। ও আবার শুধু ফুটবলে। ওকে ঘটনাটা সব বললাম। ভয়ে ভয়ে। মায় শিল্টু, নিশি এবং পেঁচো ঠাকুর পর্যন্ত। শুনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর উত্তেজিত হয়ে বললো, মারাদোনা গোল মিস করার জন্য কেউ যদি লাথি মেরে টিভি ভেঙে ফেলে কিংবা ছাত থেকে লাফ মারে ; তার জন্য কি মারাদোনা দায়ি ? তাই কখনো হয়, না হতে পারে ? ছাড় এসব।

বেশ কিছুদিন আমি অবশ্য ছাড়তে পারিনি। মনে হতো। ঘুমের মধ্যে আবার না ঘুমের মধ্যেও। আমিতো লিখেছিলাম, আত্মহত্যার মতো একটুকরো দড়িও থাকে না, সব পচে যায়। তবে, সে ঐ দড়ি পেলো কোথায় ? তার কিছুদিন পর ওই ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে লিখেছিলাম "ফাঁস" কবিতাটি। প্রথম কয়েকটা লাইন - -

"যে যুবকটি আমার "দড়ি" কবিতাটি পড়ে

বেছে নিয়েছিল ফাঁস ও আত্মহত্যার জীবন,

তার বরফ- ময়লা চোখদুটো তুলে সে তাকিয়ে আছে।

অসংখ্য বিন্দুচিহ্ন যোগ করে
সে নিজে তৈরী হয়ে উঠেছে।"

স্বকাব্যকথন

উপস্থিতি
পীযূষকান্তি বিশ্বাস

আজ বসন্ত । গাছে এসেছে নতুন সবুজ পাতা ! কিছু গাছও দেখি । তারা সবুজ । সবুজ পৃথিবীকে অম্লজান দেয় । সবুজের ক্লোরোফিল নিয়ে অ-বিজ্ঞানীরাও লিখে ফেলে অনেক লাইন । কবিতা ফল দেয় । কবি ফলাফল । এরকমই কিছু গাছ থেকে পড়ে যাওয়া আপেল দেখে কখন যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র শিকড় জাঁকড়ে ধরে । মাটি থেকে উঠে আসে ত্বরণ । উঠে আসে রিখটার স্কেলে । এনার্জি ট্রিগার হয় । কোথা থেকে যে কি ট্রিগার হয় কে জানে। না হওয়া থেকে অনুপস্থিতির পূর্ণ অবস্থানে চলে যায় পদার্থের প্রোটন কণাগুলি। প্রশ্নগুলি গাঢ় হয়। আমি কি আদৌ আছি ? নাকি নেই ? রাত্রে বিছানায় হাত দিয়ে তাই অনুভব করতে থাকি অন্ধকার কতটা কঠিন... শুয়ে থাকি এক অসীম সম্ভাবনার মধ্যে... আদৌ কি আছি ? অস্তিত্বের একটা সংগ্রাম হাতে, পায়ে, গালে, মুখে, কপালে এসে ঠেকে। কিছুটা শূন্যেরও সংগ্রাম। কিছুটা আন্তঃপ্রজাতির অস্তিত্বের সংগ্রাম। কবিতা আমাকে সেখানে নিয়ে যায় । যে আমি এক নিমেষে আমি 'আট বছর আগে' চলে যেতে পারতাম । লাশ কাটা ঘরে । এই গাঢ়তম বেদনার রক্তিম ফলে রস হয়ে অবস্থান করতে পারতাম। গল্পটা পালটায় না। এই বধূ, গৃহ, শিশু, অর্থ, খ্যাতি, যশ আমাকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধক্ষত্রে ঠেলে দেয়। ছিদ্র থেকে গলে যাওয়া অনেক অনেক শূন্য আমি ঝুলিতে এককাট্টা করব বলে আমি পায়ে পায়ে পাঞ্জাবী ট্রাকের পিছনে দৌড়াতে থাকি। যার পেছনে লেখা থাকে "বুরি নজরবালে তেরা মুহ কালা" । ট্রাক আমাকে আমার ক্ষমতার বাইরেও নিয়ে যায় । শতভাগের উপরেও থাকে আরো ভাগ ।... আমার আজকের কবিতা তাই আমাকে নিয়েই. . .

"পবনপুত্র" । পবনকে দেখা যায়না । হাতের কাছে নড়ে চড়ে, খুঁজলে জীবনভর মেলে না । কিন্তু তার অস্তিত্ব টের পাই । আমি সেই পবনের

পুত্রের কথা বলছিলাম। একটা কবিতার কথা বলছিলাম। আমার কবিতার নাম এটাই। নামকরণ করতে গিয়ে আমার একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ে। ছোট বেলায় আমি এক গল্প শুনি, হনুমানের । তার অমর হওয়ার গল্প । হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে— পবন দেবতার ঔরসে অঞ্জনা নামক বানরীর গর্ভে হনুমান জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পর তাঁর নাকি খুব খিদে পেয়ে যায় । ভোরের সূর্যকে তার ফল প্রতীত হয়। মাতৃক্রোড় থেকে সে লাফ দেয় শূন্যে । পাছে সূর্যকে খেয়ে নেয় শিশু হনুমান, তাই ইন্দ্র বজ্রদ্বারা হনুমানকে আঘাত করেন। ফলে পর্বত শিখরে পতিত হয়ে হনুমান মৃত্যুবরণ করেন। পুত্রের এই দশা দেখে পবনদেব পর্বতগুহায় প্রবেশ করে পুত্রের জন্য বিলাপ করতে থাকেন। ফলে বাতাসের অভাবে সমগ্র চরাচরে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। তখন সকল দেবতা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে, ব্রহ্মা বায়ুর কাছে উপস্থিত হয়ে, হনুমানকে পুনর্জীবিত করেন। এরপর ইন্দ্র বর দেন যে বজ্রে এঁর মৃত্যু হবে না এবং তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু হবে। ব্রহ্মা বলেন, হনুমান ব্রহ্মজ্ঞ ও চিরজীবি হবেন এবং সকল ব্রহ্মশাপের অবধ্য হবেন। গল্পটা এখানেই থাক, এবার কবিতাটা দেখে নিই. . .

"পবনপুত্র"

পথেই পড়ে ছিলো ইলাস্টিকের মেঘ
চিলের পাখনায় জড়িয়ে জ্বারিত নিঃশ্বাস
ঘড়ির ডায়ালে কোমর বেঁকিয়ে কলম লিখছিলো
চুম্বকের আত্মজীবনী. . .

পোড়ামাটির পাত্রে শকুন্তলার অ্যালজেবরা
গুণিতক হারে বেড়ে যাচ্ছে
এই গ্রীষ্মে তাপ

জ্যামিতিক হারে বাড়াচ্ছি দৈর্ঘ্য
আউট অব মার্জিন

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পার করে উড়ে যাচ্ছে গরুড়
বেলুনের পেটে বাড়ছে শিশু হনুমান
ডানা থেকে ঝরে পড়ছে রোদ

পাঞ্জাবী ট্রাকের পিছনে পিছনে
মুহ কালা করে এক একটি যক্ষ

প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছি মাইলস্টোন থেকে মাইলস্টোন

এই কবিতায় হনুমানের জীবন কাহিনী নেই । আছে জীবনের খেটে খাওয়া গল্প । গাছের মতই। যে গাছ গুড়ি হয়ে পড়ে থাকে আদাড়ে, বাদাড়ে, রণে, বনে ও জঙ্গলে । সে খেটে হয়ে যেতে যায় না, সে বসন্ত দেখে, পাতা মেলে দেওয়ার আকাশ । হায় ! গাছ, তবুও সে কোনভাবে শ্রমিক নয়, সে এক ব্যক্তিত্ব । সে এক প্রগতিশীল প্রবাহ, তার গা সবুজ । প্যারেনকাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা জুড়ে তার আদিম মাটির টান । এখান থেকেই ট্রিগার হয় তার বেঁচে থাকার সংগ্রাম । তার 'ইচ্ছে'র জন্ম হয় । তাড়না । কিভাবে আবেশের গায়ে আবেশ লেগে লোহা চুম্বক হয়ে যায় । কিভাবে সেই চুম্বক বদলে দেয় কম্পাসের জীবন বিচিত্রা । আকর্ষণ বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে তার উত্তর বা দক্ষিণমেরু খুঁজে নেবার তাগিদ । আর জীবনও যেন নাছোড়বান্দা চুম্বক। যেভাবেই তাঁকে রেখে দাও, ঠিক খুঁজে নিতে চায় তার দিক । আমিও কি খুঁজিনি আমার রাস্তা ? ''চুম্বকের আত্মজীবনী'' আমি এখান থেকেই পাই । আমার খোঁজ চলতে থাকে, বিভিন্ন দিক, তল, টান, আমি খুঁজতে থাকি তার উৎস । নাকি সেইসব খোঁজ ছিলো 1D সরল রেখা? একবার একটু 3D ছবির দিকে তাকাই । আমাকেও কি আগে পিছে এক্স, ওয়াই জেড অ্যাক্সিস বরাবর বাড়াতে হয়নি দেহ ? ছোটবেলা থেকে হাঁটতে শিখেছি তার পর দৌড়... প্রতিটা স্কুল পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ করেছি যে ক্ষমতার থেকে বেশীদূরে লাফাতে হয়। মাড়াতে হয়েছে এক অজানা লক্ষ্য। ভেঙে চলেছি প্রতিপদে এক নতুন পথ । জিন্দেগী হর কদম ইক নয়ী জংগ হ্যায় ।

কাজটি কোন মানুষের কাছেই সহজ ছিলো না । গুহামানবের কাছেও না। এখানে এই লাইনটি তাই অবধারিত ভাবে এসেছে ''চিলের পাখনায় জড়িয়ে জ্বারিত নিঃশ্বাস''। প্রতিটা জার্নির পর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ অনুভব করেছি। এই শব্দ শোনা যায় কি? নাকি খামখেয়ালী এই সব অনুভুতি? তাই বলে বালতিতে টানিনি কি জল, হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল, কোমর বেঁকিয়ে কুপিয়ে দেখিনি দু- হাত কোদাল...? হ্যা, নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় । । ''কোমর বেঁকিয়ে'' শব্দটা আমার এই বিষয় ভাবনা থেকে লেখা ।

আমাদের দেশে অনেক গণিতজ্ঞ জন্মেছেন । খ্যাতি আছে 'রামানুজন', 'রাধানাথ শিকদার', 'সত্যেন বোস' ইত্যাদী। আমি একজনের নাম জানি 'শকুন্তলা' যিনি এই সব গণিতজ্ঞের মধ্যে পড়েন না । কিন্তু তিনি নাকি কম্পুটারের থেকেও তাড়াতাড়ি অংক কষে দেন । আমার কাহিনীর সাইডরোলে তাঁকে আমি আজ ইনস্টল করছি । মানুষের সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে । মানুষ তার প্রতিকূলতা কে বশ মানিয়ে বেঁধে ফেলছেন ঘর । এই শতাব্দীতে এই লড়াইটা সাংঘাতিক মোড়ে এসে দাড়িয়েছে । আমরা পিরামিড বানিয়েছি, ব্যাবিলনের ঝোলান উদ্দ্যান সৃষ্টি করেছি, বানিয়েছি চীনের প্রাচীর । ভালোবেসে শ্বেত পাথরে খোদাই করে স্থাপন করেছি ভালোবাসার তাজমহল । আজ আমরা কম্পিউটারের আবিষ্কারের পর খুলে ফেলছি এক বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্ব ...জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এই অগ্রগতি । আমাদের সভ্যতা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে নালিফাই করে আগে বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের এই জার্নি পথ রেখা বর্গক্ষত্রে ও তার চার দেওয়ালের সীমানা দিয়ে আবদ্ধ করা যাচ্ছে না । এ- ফোর (A4) কাগজে আমরা সাধারণত প্রিন্ট আউট নিই। সেই প্রিন্ট আউটের একটা মার্জিন থাকে, সেই

মার্জিনের মধ্যে কন্টেন্টগুলি প্রিন্ট হয় । সেই প্রিন্ট এরিয়ায় আমারা প্রতিদিন আমাদের এই ডিউটি অনুযায়ী যে যার মত প্রিন্ট হয়ে আসছি । কিছু লোক সেই প্রিন্ট এরিয়ার বাইরেও প্রিন্ট করার কথা ভাবেন । 'আউট অব প্রিন্ট এরিয়া' থেকেই আমার এই 'আউট অব মার্জিন' নেওয়া । আর সত্যিই তো, নিজে কতবার প্রিন্ট হয়ে গেছি । ক্ষেত্রফল এরিয়া বেড়েই যেতে থাকে এক ক্রমবর্ধমান গতিতে । একে ত্বরণ বলে অভিহিত করা যায় না ।

আসলে, এই জার্নিটা বেলুনের মত। যতই হাওয়া ভরো, বাড়তেই থাকে। অলটিচুড বাড়তে থাকে। পবনপুত্ররাও বেলুনের পেটে বাড়তে থাকে। আমাদের ত্রিমাত্রিক সাইজ বাড়তেই থাকে। আর আমরা আরো আরো উপরে উঠতে থাকি । এই বেলুন ওড়ানো নিয়ে আমার আরো একটা কথা মনে পড়ে...তখন আমি বিমান বাহিনীতে কাজ করি। অল্প বয়স । আমি 'বেস অপসে' কাজ করতাম, তার পাশেই ছিলো 'মেট' অফিস। ওরা আমাদের 'আবহাওয়া'র খবরা খবর দিতো । কি ভাবে ? একটা উদাহরণ দিই;
ফোন উঠালাম
"হেলো, মেট, হোয়াট ইজ দা ওয়েদার অ্যাট টুয়েল্ভ''
জবাব এলো,
"জিরো ওয়ান জিরো / ওয়ান জিরো সিক্স, ফেয়ার , ক্লাউডস নিল, থার্টি থ্রি ডীগ্রি, কিউ এন এইচ ওইয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ''
এটাকে ডিকোড করলে এরকম দাঁড়ায়, এই কবিতাতে তৃতীয় লাইনে যান । একটা ঘড়ির উল্লেখ আছে । ঘড়ির কম্পাসটা বের করো । এতে তিনশো ষাট ডিগ্রি অঙ্কন করা আছে । জিরো ডিগ্রীটা নর্থ । কম্পাসটা নর্থ বরাবর অ্যালাইন করে "জিরো ওয়ান জিরো" কাঁটার দিকে তাকাও । হাওয়াটা ওই দিক থেকে আসছে। আর ঘন্টায় "ওয়ান জিরো" মানে দশ কিলোমিটার বেগে বইছে । খালি চোখে তাকালে 'সিক্স' কিলোমিটার পরিস্কার দেখা যায়। 'ফেয়ার' মানে, মোটামুটি ভালো আবহাওয়া । কোন মেঘ নেই আকাশে, বাতাসের চাপ ১০১৫ । জানি গল্পটা জমল না, কিন্তু প্রশ্ন হলো 'মেট' অফিস এই এতো ইনফর্মেশন গুলো জানতো কি ভাবে ?

ওরা বেলুন উড়িয়ে দিতো । বেলুনে হাল্কা হিলিয়াম গ্যাস ভরে দিয়ে । বেলুন উড়ে যেত আপন খেয়ালে । আমি দেখতাম তাকিয়ে । যতদূর আমার ছোটবেলার পতঙ্গা ঘুড়ি না যেত, এই বেলুনগুলি তার আরো অনেক উপরে উড়ে যেত । মেঘের খুব কাছে । মেঘের নরম বুকে ডুবে যেতে যেতে ওই বেলুনরা জানতে দিত যে ওখানে বাতাস কি বেগে বইছে । কি তার ডাইরেকশন। কি মাত্রায় তাপমাত্রা ওঠানামা করে । তাকিয়ে থাকতাম। আমি ভাবতাম, আমরা এই কত দূর উঠে এসেছি বেলুনের সাথে । সত্যি তো, আমরা বাতাসের বেগ ও দিক দেখে এরোপ্লেনের গতিও নির্ধারণ করছি । হাজার হাজার আকাশযাত্রীরা আমাদের সাথে উড়ছে । সমগ্র মানব জাতি উড়াল দিয়েছে । আমরা আরো একটা কীর্তিমান পৃথিবীর বুকে কায়েম করলাম। 'ইলাস্টিকের মেঘ' কথাটা প্রথমবারে আমি লিখিনি, লিখেছিলাম ইলাস্টিকের রাবার, কিন্তু রাবার তো ইলাস্টিকেরই হয়, সেটা লিখে আমি তেমন খুশী ছিলাম না । কিন্তু মেঘেদের বেড়ে যাওয়া শরীর দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই। লাইনটা এরকম দাড়াল, "পথেই পড়ে ছিলো ইলাস্টিকের মেঘ" । জানি এই মেঘ যাত্রায় বেলুনদের ইলাস্টিক হয়ে অনেক ফুলে যেতে হয়েছে কিন্তু এই এক সঙ্গে এটা প্রিন্টও করে গেছে আর এক বিজয় কাহিনী । আমাদের প্রত্যেকটা জার্নি এক একটা নতুন মাইলস্টোন । "প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছি মাইলস্টোন থেকে মাইলস্টোন" এই লাইনটি আমার এভাবেই এসেছে । এই যাত্রায় আমারও ব্যক্তিগত যাত্রার অভিজ্ঞতা মিশে আছে । পথ কে ভাগ্য বলে সর্বক্ষণ মেনে নিইনি, তাকে হাইওয়ে বানাতে চেয়েছি। অস্তিত্বের সংগ্রামে আমিও ডুবিয়েছি পা। লেফট রাইট লেফট কোরাসে যুদ্ধে মিলিয়ে দিয়েছি কদম। বসন্ত ফিরে গেলে রণক্ষত্র জুড়ে বৃষ্টি আসুক এবার। শিকড়ে শিকড়ে বৃষ্টি কণারা জানান দিক শ্রাবণ এসেছে ।

গাছ বেঁচে থাক । এখানে থাকা বা না থাকাটাই প্রাকৃতিক ।

কোন রচনা শৈলী এ কবিতায় আছে কিনা, কোন ধ্বনি মন্ত্র কানে বা প্রাণে আঘাত করবে কিনা সত্যিই ভাবিনি, সূক্ষ্মতার কথা কখনো মাথায় আসেনি। এই সব যাত্রা কাহিনীতে ঘামের উপস্থিতি আমি উপস্থাপন করতে চেয়েছি, তা কতটা কবিতায় প্রবাহিত হয়েছে সে বিষয়ে আমার মাপ জানা নেই, কবিতাটি আমি আমার "ঘুমঘর" গ্রন্থটিতে স্থান দিতে পেরে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছি । আপনাদের পাঠপ্রতিক্রিয়া আমার ভাবনার থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু জানতে আগ্রহী থাকব ।

স্বকাব্যকথন

"শূন্য ভরে বিহার করে সে দেশে কেমনে যাই". . . !
রমিত দে

অভিগমন

শূন্যতার ব্যবসায় চুরি নেই
সেজে গুজে গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছে স্নায়ু
ছুটছে ঐ মানুষের বাগান বেড়া খুলে, বোতাম ছিঁড়ে ...বেনেবৌয়ের পিছনে

আলো বলছে, 'সাবধানে নামিস'
আর সিঁড়ি গুনতে গুনতে সেলাই করছে পবিত্র ছায়া
আর ছায়া, বকশিশ পেয়ে বাচ্চাদের বয়া কিনে দিচ্ছে
বয়ে যাচ্ছে
বয়ে যাচ্ছে
আশ্চর্য বিশ্রাম যে
বৃষ্টি ঘুরে ঘুরে খুঁজছে দরজা

তুমি তো সব জানো এখন নিড়েন চলছে
বেলুন থেকে বালিয়াড়ি, বৃষ্টি বলতে
বাকি থাকছে একটা. . .

শ্যাওলা পড়ছে রোজ
ধুয়ে মুছে ভেঙে যাচ্ছে জলের যৌথ পরিবার
রোজ শ্যাওলা পড়ছে
আকাশের বর্ণমালা শিখছে অ্যাকোরিয়ামের বাসনকোসন

তবে কি জীবিতকে ধরে ফেলবে সরল ঝরনা !

ধানের পাড় ধরে টান দেয় কেবল একটি ধারণা
চান বিঁধে গেলে প্রবাহে, পঙ্গু রোদে. . .
দেখা যায় গোটা গানটিকেই
একদিন এইভাবে
দুটি হাঁস হরবোলা ফেলে গেলে
একটিই ঘুম থেকে উঠে. . .

কোন আর্তিতে একটি কবিতা লেখা হবে বা কোন অভিক্ষেপে একটি কবিতার কাছে থমকে দাঁড়াবে পাঠক সে প্রশ্ন চূড়ান্ত সূত্রে পরিণত হতে হয়ত কোনোদিনই পারবে না কারণ কবিতার হেলে পড়া ঘরে স্নায়ুর নিভৃত উৎক্রান্তি নিয়ত। তাই কবিতা লেখার পর কেন লেখা হল বা সে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে সত্যিই তার কোনো স্থির মীমাংসা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তবে একটা বোঝাবুঝি থাকে, কবির সাথে পাঠকের, পাঠকের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে পৃথিবীর, আর পৃথিবীর সাথে কোনো এক অজ্ঞাত পরার্ধের বোঝাবুঝি থাকে, ব্যঞ্জনা থাকে। এ এক নিরন্তর অভিযান। যে জীবন যাপন নিংড়ে কবিতা তুলে আনেন কবি সেই জীবনযাপনে জড়িত পাঠকও আর তাই কবিতার ধানে খইয়ের মত ছড়িয়ে থাকে পাঠকেরও বিচিন্তা বিস্ময়। ফলে কবিতার শরীর আসলে চিরজাগ্রত, তার প্রতিটি বর্ণের সাথে বাঁকের সাথে বিপরীর বর্ণের বিপরীত বাঁকের চিরসখ্যতা। এখন এই কবিতার কাঠ শরীরটা পড়েই থাকে প্রাত্যহিকে, ইথারে। কবি তার মধ্যে স্বকীয় চিত্রকল্প গলিয়ে দেন বাক নামে চক্ষু নামে শ্রোত্র নামে মন নামে কিন্তু তখনও সে কবিতা বাক দিয়ে কথা কয়ে চোখ দিয়ে দেখে কান দিয়ে শুনে আর মন দিয়ে ভেবেও কোথাও যেন শুয়ে থাকে। আর যে মুহূর্তে পাঠকের হাতে এসে পড়ল কবিতাটি আর পাঠক তাতে প্রাণ প্রবেশ করাল, তাকে তার অংশকথনের সামিল করতে চাইল, তার হাজার একটা যোগফলের আর বিয়োগফলের বীক্ষা যোজনা হল, ওমনি সে উঠে দাঁড়াল। কবির হয়ত কোনো দায়বদ্ধতা নেই সে অর্থে পাঠকের কাছে, বোঝানোর দায়িত্বও হয়ত নেই, কিন্তু একটি কবিতার দায়বদ্ধতা থেকেই যায়

পাঠককে প্রাণিত করার ক্ষেত্রে, পাঠকের ক্ষীণ থেকে ক্ষীনায়ু আয়তনগুলোকে তার নিজস্ব ফ্রেমে উতলা করে তোলার ক্ষেত্রে। কারণ এই যে ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত – কবিতার ভেতর সেই না আঁকা ছবির জায়গাতেই পাঠক ফিরে ফিরে আসে নিজের কল্পনার সমস্ত কুয়াশা নিয়ে সমস্ত ছবি নিয়ে। ফলে কবিতার বিষয়- অবিষয় কিংবা কবিতা লেখা অথবা কবিতা পাঠ এই পুরোটাই কোথাও যেন একটা জন্মকালীন গর্ভধারণের মত। থাকা না- থাকার মাঝে এক ঘুমন্ত আবিষ্কার। "Art is an utterance of the imagination addressed to the imagination and to rouse imagination"- হ্যাঁ, কল্পনা থেকে কল্পনা অবধি দানা বাঁধাতেই হয়ত এ কবিতা আলোচনা, তবে মন থেকে মনান্তরে ডুব দেওয়ার আগে তার উৎস ও উজানে লেগে থাকা কিছু সচেতন পরিমাপের কথা বলা দরকার। শব্দের গড়ন ফোটাবার জন্য কিছু ছায়াযুক্ত চ্যাপ্টা রেখা বা বেসিক সেডেড লাইনের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ কিছু প্রাকলিপি। কি সেই প্রাকলিপি? কিছুদিন আগেই প্রাচ্য লোকচিত্রের উপর লেখালিখির সূত্রে নন্দলাল বসুর পটের ছবি আঁকার নিয়মনীতি সম্বলিত কিছু লেখা হাতে আসে। কোন রঙ কোন পর্দায় ব্যবহার হবে বা রঙগুলি কি পরিমানে মেলাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। নন্দলাল বসু বলছেন- "মিশ্র রং নতুন করে তৈরী করতে গেলে কখনোই পুরোনো রঙের সঙ্গে হুবহু মিলবে না। তাই প্রথমেই যে কোনো রঙ যে অনুপাতে গাঢ় দেখানো উদ্দেশ্য তার থেকে ফিকে করেই তৈরি করতে হবে। এবার সব ছবিতে একেবারে রঙ ভরা হয়না। পাতলা স্তরের উপর স্তর চাপাতে হয়। তুলি একবার উপর নীচে আর ফিরে বার আড়াআড়ি চালনা করে, তবেই ব্লকের সবটায় সমানভাবে রঙ ভরা হয়, অবাঞ্ছিত জলের বা তুলির দাগ থাকে না, আর ক্রমে ক্রমে ফিকে রঙই দৃশ্যত গাঢ় হয়ে ওঠে।"- এখন কবিতা তো শব্দেরই বোধেরই চেতনারই এক মিশ্র রঙ, ছোটো ছোটো ফুটকি ফুটকি সাজিয়ে সেই অসমান শব্দগুলোকে একটা স্বচ্ছ সমান টেম্পেরায় পরিণত করা; হয়ত পাঠক এই সমানকেই আবার আর এক পোঁছ তুলি বুলিয়ে আরও একটু অসমান করে দেবে কিংবা স্বকীয় অনুভূতির ঈষৎ জল দিয়ে শব্দের ধারগুলো মুছে মুছে বেশ মোলায়েম করে নেবে, তবে সে সবই কবির হাত থেকে কবিতার হস্তান্তরিকরণের পরের কথা। কিন্তু খুব সচেতনভাবেই কবিতার মধ্যে আমিও ঘনগভীর আবহমানের মিশ্র রঙে খুঁজে ফিরেছি একটিমাত্র ফিকে রংকে, অস্তির সেই নগ্নতার প্রশ্নটাকে সেই শূন্যতার প্রশ্নটাকে। জীবনের ক্ষণিক সমগ্রতার টানে যে শূন্যতার চিরন্তন সাহচর্য সেই আমার কাছে ছিল সত্য। কেবল সত্য নয়, রবীঠাকুর যেমন বলতেন - "জগতে দুরকমের পর্দাথ আছে, এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে- আরও সত্য। আমার কারবার আরও সত্যকে নিয়ে" – ঠিক তেমনি থাকার মাঝে এই না-থাকাই আমার কাছে হয়ে উঠেছে সেই আরও সত্য। কবিতার পোশাক খুলতে খুলতে আমি কেবল সেই কায়ার প্রাকৃত ভাষার কাছে পৌঁছোতে চেয়েছি, পৌঁছোতে চেয়েছি একটি ঘোরের কাছে, ঘুমন্ত মনের কাছে. . .

শুরুতেই কবিতাটির হিঙ্গুল রঙের চালচিত্রে যে গেরি - এলা - পাথুরে সবুজ মাটি দিয়ে ছবিটা ধরা তাকে কল্পনার ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। ধরা যাক একটা ঘোরানো পেঁচানো সিঁড়ি। ওই সিঁড়ি বেয়ে বেয়েই ওঠা নামা করছে বিত্ত আর রিক্ততার অনুপ্রাসগুলি, ভবচক্রের চিরন্তনতাগুলি। আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে আমি তুমি আমরা- আর আমাদের সামনে সামনে আমাদের ছায়ারা- পৃথিবী নামের মন্ডনশিল্পের এমনই সব আলোছায়ারা দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি নামের এই আমি তো কোথাও নেই ! তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে কেবল আমি নামের ওই ছায়াটি দোল খায়। সিঁড়ি দিয়ে যে নেমে আসে সে তো একটি ন্যুড ফিগার, 'আমি'র এক নিরাবরণ রূপ। তো আনন্দবেদনাময় এই মহাকালের মাঝে দাঁড়ানো দৃশ্যময় ওই শূন্যতাটিকে নিয়েই শুরু হল আমাদের কবিতা। কবিতার প্রথম পংক্তিটিকে - "শূন্যতার ব্যবসায় চুরি নেই"- কবিতার শেষ পংক্তি বলা চলে আবার কবিতার শেষ পংক্তিটিকে- "দুটি হাঁস/হরবোলা ফেলে গেল/একটিই ঘুম থেকে উঠে" কবিতার প্রথম পংক্তি বলা চলে। প্রতিতুলনা করলে দেখা যাবে শাব্দিক বাক্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও পংক্তিদুটির মাঝে কোনো আত্মিক প্রতিরোধ বা দার্শনিক অবিশ্বাসের জায়গা নেই। কারণ দুটির মধ্যেই নিহিত হয়ে আছে একটিই যাপিত সত্য একটিই জীবিত নিষ্ক্রিয়তা - আর তা হল এক সৃষ্টিগর্ভ শূন্যতা। অস্তি যাকে সাথে নিয়ে এসেছে, যে সাথে সাথে ঘুরছে অস্তির ছদ্মবেশে। এখন এ কোন

শূন্যতা? শূন্যতা নিয়ে তো বিচিত্র ব্যাখা। এ নাস্তিত্ব তো নয়, কারণ শূন্যের মধ্যেও এখানে অস্তিত্বের স্বর শোনা যাচ্ছে, ফিরে ফিরে আসছে অস্তির চিত্রকল্প। অর্থাৎ আমাদের এই শূন্য সত্তাটির চূড়ান্ত পরিণতিকে আমরা অস্তিত্বও বলতে পারছিনা আবার নাস্তিত্বও বলতে পারছিনা। আসলে এ হচ্ছে সেই অস্তিত্বের অভাববশতঃ স্বভাবশূন্য যেখানে বাস্তবসত্তা বলতে সমস্ত বহুত্বের শেষ পরিণতি অদ্বয়- তাই শূন্যতা এখানে কেবল সেই অভাব নয় বরং বাস্তবসত্তা এবং বহুত্বের অস্তিত্বহীনতা। "It doesn't mean Nihilism or void, it means on the other hand to be devoid of ultimate reality and plurality (Mula-Madhyamik Karika)।" - নাগার্জুনের "মূলমাধ্যমিক কারিকা" এর প্রথম দু শ্লোকই শূন্যবাদের কি অপূর্ব ব্যাখা দিয়ে গেছে - "অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতঁম অনেকার্থমনাগমমনির্গতঁম"- অর্থাৎ এই ব্রহ্মান্ডচরিত্রের চারপাশের এই এত এত যে সৃষ্টি তাকে নিরোধ করবার যেমন শক্তি নেই তেমনি তার উৎপত্তি বলেও স্থায়ী কিছু নিরূপণ করাও যাবেনা। অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী এই দুই- ই যে অজ্ঞাততত্ত্ব, দুই- ই যে অভেদ্য অপ্রবেশ্য আর এই সেই শূন্য যার ছায়ায় বসে বারবার ফিরে ফিরে আসছি আলো নামের কোনও এক মিথ্যে ব্যাখার কাছে; মানে সব শেষে আসলে একটা ছায়ামাত্র, এই অস্তিত্ব এই অনস্তিত্ব এই অনুগত আকরগুলো আদতে ছায়ামাত্র। মানুষের হাত থেকে যেমন মানুষ খসে যায় অথচ মানুষের হাতেই পড়ে থাকে মানুষের ছায়া আর ওই ছায়াই তো প্রজন্মের পর প্রজন্মের ব্যঞ্জনাময় খসড়াটি বানিয়ে তুলেছে। এই ছায়াই যে একমাত্র জীবিত। 'চাঁদের মত মুখ, উষার মত হাসি'- ওই যে আমাদের সন্তানরা ওরাও তো আসলে ছায়া, যা কখনোই ধরা যায় না। পাথর দিয়ে রঙ দিয়ে মাটি দিয়ে কিচ্ছুটি দিয়ে না। ছায়া যায় ছায়া আসে, আমাদের আত্মজীবনীর পুরোটাই যে ওই ছায়াকে মুছতে মুছতে ক্লান্ত। কিন্তু দৃষ্টির পরে থাকে সৃষ্টি আর সৃষ্টির জন্য থাকে অপেক্ষা, ইমেজ থেকে ভিশনে যাওয়ার অপেক্ষা। সত্য কি? প্রাণের জাগরণ! নাকি যাপন নামের জোট বাঁধা এই মিথ্যেটুকুর তথ্যসন্ধান! রঙ লাগলেই যে শুষে নিচ্ছে ক্যানভাসের ওই ছায়াশরীর, তাই এবার ঠিক করি মসলাকে বেশি করে ভিজিয়ে দিতে হবে, যাতে কাঁচা আমির ভেতর জল চুঁয়ে চুঁয়ে ভেতরবুঁদ অবধি ভিজে ভিজে রাখে। আর এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি শরীর নাই কিন্তু তার স্মৃতি আছে ছায়া হয়ে, পাটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেই ছায়াকেই সমান করছি, উসো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওর শরীর থেকে চুন চুন ভাব বালি বালি ভাব তুলে ফেলছি। ছায়া থেকে মানুষ হচ্ছে থাকা হচ্ছে কোলাহল হচ্ছে কিন্তু ছবি হচ্ছে কই? সেই ছবি যার জন্য এত চিহ্ন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছি, ফলে বাকি একটা কিছু থাকছে। এবার আপনারা পাঠকেরা এই অপূর্ণতার কাছে খানিক বসুন। না, বিনয়ের মত আপনাদের বলব না - 'আকাশের দিকে তাকান/ দেখুন একটি পাখি বসে আছে'। বরং জলের দিকে তাকান। স্মৃতি সৌরভ কীর্ণ একটি সুখ আপনি জলের কাছেই রেখেছেন হয়ত জলে তার প্রতিবিম্ব দেখবেন বলে, দেখবেন রোজ কেমন বাড়ছে আপনার থাকা, আপনার বিশ্বাসযোগ্য বেড়ে ওঠা। কিন্তু আরেকটি সুখ যা জলের যা একান্তই ওই ওঁত পাতা স্থিরতার তা আপনি হয়ত দেখেননি কারণ সে শব্দ করে আসেনি, বলে আসেনি। সে বসেছে অস্তিত্বের গালে গাল ঠেকিয়ে, স্থিতির মাঝে অন্ধকার কুড়োতে আতসকাচ ধরে বসেছে। এই সেই জল যে একমাত্র আমার আপনার ছায়াকে গিলতে পারে, সরল করে দিতে পারে আমার আপনার শূন্যতাকে। ওই শূন্যতাকে আঁকতেই যেন শূন্যতার মিশ্র রং তৈরি করার আজন্ম প্রচেষ্টা! ঠিক নন্দলাল যেভাবে একটা ফিকে রংকে গাঢ় করার প্রকল্পনা এঁকেছেন এবং ধীরে ধীরে রং চাপানোর কথা বলেছেন ঠিক তেমনি আমার কাছেও ছিল সদাভ্রাম্যমান শূন্যতার কিছু ফিকে আধা ফিকে গাঢ় ফিকে টোন, জানতাম যেকোনো দুটি শূন্যতার ভেতর ছায়ার এতটুকু বুদবুদ থাকলে চলবে না আর একেবারে রং ভরা যাবে না জেনে ধীরে ধীরে একবার উপর নিচ আর ফির বার আড়াআড়ি পোঁচ দিয়ে পৌঁছতে হবে সেই ঝরনা ঝরনা গন্ধের কাছে, যেখানে সরল আছে শূন্য আছে গাঢ় হয়ে শূন্য হয়ে; যেখানে দরদ আছে দৃষ্টি আছে 'নেই' নামের একটি শব্দের। শুরুতে সিঁড়ির উপর যে ছায়া তার ঘনত্ব সবচেয়ে কম, আর একে একে তার ওপর থাকার কিছু অপসারী রেখা চাপানো হয়েছে শূন্যতার আয়তন ও গভীরতাকে পুনঃপুনঃ বাড়াতে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমি আসলে আরও একটা শব্দকে ভুলতে চেয়েছি - "থাকা"। আর তাই 'নেই' এর চোদ্দ পিন্ড দিয়ে থাকার চোদ্দ জায়গায় বৈশ্বদেব বলি দিয়েছি যাতে থাকার সাথে না- থাকার একটা একতা স্থাপিত হয়। সম্পূর্ন কবিতায় 'থাকা'র প্রতীকি শৃঙ্খলাকে জেনেবুঝে বর্জন করা হয়েছে। করতে চেয়েছি। এর অন্য কোনো

প্রতিকল্প খুঁজে পাইনি তাই। তাই তাকে আর স্মৃতিতে ফেরাতেও পারিনি। ব্যক্তিগত স্তরে আমার মনে হয় কবির অবচেতনে এমনই কিছু গর্ত থেকে যায় লাঁকার সেই BEANCE এর মত ,যেখানে বর্জিত অভিজ্ঞতাকে আর কোনোদিনই স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনা যায়না, কবি চানও না ফিরিয়ে আনতে কারণ তিনি তখন তার চেতনায় সিগনিফায়ারকে প্রতিস্থাপিত করে নিয়েছেন সিগনিফায়েড দিয়ে অর্থাৎ অর্থকারক ইমেজকে তিনি কৃত অর্থের ইমেজারি দিয়েছেন, এই তার নতুন রূপপ্রকল্প যার নৈঃশব্দ্যে তিনি পারিপার্শ্বিক সব শব্দকে সব স্থিতিকে খুব আস্তে ডেকে নেন। লাঁকার পরিকল্পিত এই BEANCE বা গর্ত বা এই বর্জন প্রসঙ্গে অনিকা লম্যার দেওয়া একটা উদাহরণকে প্রাবন্ধিক গবেষক অমল বন্দোপাধ্যায়ের তর্জমায় একটু ভাগ করে নেয়া যাক- ‘‘ধরা যাক একটি দেশ, যে দেশে পুলিশের চলতি নাম ‘চড়াই’। যেমন, প্যারিসের স্ল্যাং এ পুলিশের নাম ফ্লিক এবং লন্ডনে ববি। কোনো এক রাত্রে কোন এক ব্যক্তি সবান্ধবে ‘বার’ থেকে প্রচুর মদ্যপান করে রাস্তায় মাতলামি করার সময় পুলিশ বা চড়াই কর্তৃক ধৃত হয়ে পরে বাড়ি ফেরেন। নেশার চাপে ঐ ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে আর থাকে নি। কিছুদিন পর ওই ব্যক্তি প্রলাপ বকতে থাকেন হয় শারীরিক বা মানসিক রোগে এবং তার একমাত্র বক্তব্য হয়ে ওঠে যে তিনি প্রচুর চড়াই পাখির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। স্মৃতি থেকে চিরকালের মত মুছে যাওয়ার ফলে এখানে অর্থকারক চড়ুই ও কৃত অর্থের পুলিশের মধ্যেকার চিহ্নতাত্ত্বিক সম্পর্ক অদৃশ্য হয়। একেই লাঁকা বলছেন গর্ত।’’ -

উপরের অংশে ব্যক্তিটির স্মৃতিবিভ্রমের কারণ মানসিক হলেও একজন কবি হয়ত অস্তিবাদের বিচ্ছিন্নতাকে স্মৃতি থেকে মুছে নিতে চান জেনে বুঝে অনস্তিত্বের সেই শান্ত স্বরূপটির কাছে পৌঁছোতে। তাই তার কাছে অবচেতনের এই শূন্য গর্ত আসলে সর্বতোভাবে একটি কাঙ্খিত জিনিস নাহলে সে ক্ষণকালের এই ছায়াকে চিরকালীন এক শূন্যের টোটালিটি দেবে কি করে ! আসলে সবকিছুর আগেও একটি অভাব আর সবকিছুর পরেও একটি অভাব আর এই অভাবকে চিনতে গেলে কবিকে ওই নিঁখুত গর্তটি খুঁড়ে রাখতেই হবে যেখানে এই মায়াপৃথিবীর মিথ্যে বিভ্রম প্রহেলিকা সব একে একে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি হয়ে উঠবেন অনিরুদ্ধ, এই অনিরুদ্ধ আত্মা তার মায়া সম্পর্কে সচেতন, সচেতন তার বদ্ধতা সম্পর্কে তাই সে ক্ষণিকের জন্য হলেও ওই আশ্চর্য গর্তের মধ্যে ছেড়ে আসে তার ভাঙা ভাঙা ঘটনাকোলাহল আর এই প্রলম্বিত থাকার মধ্যে দিয়েই এক নিরাভরন ফেরার রাস্তা খোঁজে। আমিও খুঁজেছি, খোঁজার চেষ্টা করেছি, জানি নিরুদ্দেশ যাত্রা হয়ত পাইনি কিন্তু শূন্যতার শিল্পের কাছে আরও এক পা হেঁটে আসতে চেয়েছি।

এখন কবিতাটির অণু থেকে তনুতে আসা যাক, আলো থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কথা থেকে কিছু কিছু কঙ্কালের ভাষায়। সপ্তম ও অষ্টম পংক্তিতে একই বাক্যের ব্যবহার (বয়ে যাচ্ছে) হয়েছে। কিন্তু তা একই অর্থবহ করার প্রচেষ্টায় নয় বরং দুটি বাক্যের মধ্যবর্তী নাড়ির যোগ কাটতে একধরনের ফ্রি ভ্যারিয়েশন দেওয়ার আকুতি ছিল। ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আসলে তার আগের ও পরের বাক্যের বাঁধুনিটি শিথিল করার সাথে সাথে ভাবের বাঁধুনিটি মজবুত করার । ঐতিহ্যগত ব্যাকরণ বলছে শ্রোতার মনে যে আকাঙ্খা তা বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হওয়া চাই, শ্রোতার মনে কৌতুহল জাগিয়ে যদি কোনো বাক্য মাঝপথে থেমে যায় তা হলে সেই বাক্য পূর্ণ হল না। কিন্তু কবিতায় এই মাঝপথে ছেড়ে আসার মধ্যেই হয়ত কবি পাঠকের কল্পযোগ। এই ছিন্নচেতন থেকেই শুরু হয় রূপ ও রূপান্তরের নতুন স্ফূরণ । এখন সপ্তম পংক্তির ‘‘বয়ে যাচ্ছে’’কে স্বনির্ভরতায় পর্যাপ্ত করিনি কারণ সে তার আগের পংক্তির বয়ার ইনক্লুডেড পজিশন বা অন্তর্গত অবস্থান, সে একটি অবয়বের অংশমাত্র। এই ‘‘বয়ে যাওয়া’’র মধ্যে দিয়ে ওই বয়াটি অ্যাবসুলেট পজিশন পাচ্ছে। এই ‘‘বয়ে যাওয়ার’’ মধ্যে সবটাই আমাদের জানা, প্রত্যক্ষিত, ধরাবাঁধা কিন্তু তার পরের ‘‘বয়ে যাওয়া’’টিকে দেওয়া হয়েছে একটি রূপাতীত রং, একটি গুন্ঠিত ছাঁদ, একটি হাতড়ে বেড়ানো। এই ‘‘বয়ে যাওয়া’’ ক্রিয়াটিকে একেবারে মাঝপথে ছেড়ে আসা হয়েছে তার নিজস্ব প্রাণবত্তা দিয়ে। ফলে অষ্টম পংক্তির ‘‘বয়ে যাচ্ছে’’ নিজেই একটি অ্যাবসুলিউট পজিশন যা বহমানতার অনুরণন পেরিয়ে আমাদের চিরকালের মিথ্যে ভাসমানতাকে ডিফাইন করছে; শুধু তাই নয়, অষ্টম

পংক্তির ‘‘বয়ে যাচ্ছে’’- র মত একটি নিউট্রাল বাক্যের আগে ও পরে জুড়ে দেওয়া হল কিছু সংশয়। যার ওপরে প্রাণস্রোত তো নিচে প্রস্থানভূমি, যার আগে অর্জন তো পরে বর্জন সংযুক্ত হওয়ায় একদিকে যেমন অষ্টম পংক্তির এই ‘‘বয়ে যাওয়া’’ ক্রমশ তার আগের বয়ার সাথে টান হারিয়ে ফেলছে তেমনি নবম পংক্তির ‘‘আশ্চর্য্য বিশ্রাম’’ শব্দটি ক্রমশ তার অপরিহার্য হয়ে উঠছে। অর্থাৎ যে বহমানতার চিত্রলিপি বা পিকটোগ্রাম ছিল ‘বয়ে যাওয়া’’ বাক্যটি তাই কবিতার অবিন্যাসের ভেতর এসে স্থূল থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে একটি স্থিরতার ভাবলিপি বা ইডিওগ্রাম হয়ে উঠছে। আসলে বাস্তব জগত থেকে যে ছবি কবিতায় উঠে আসে তার ভেতরে দেখার এক ধরনের একাধিক ধরনের উপায়কেই ধারণ করেন কবি, তিনি যেমন অসীম দৃশ্যরাজি থেকে বাছাই করে নেন বাস্তবের ছবিটিকে, তেমনি তাকে পুনস্থাপিত করেন একাধিক সম্ভাবনাময় স্ন্যাপশটে । আর কবিতার দেহে অনূদিত প্রতীকায়িত ধারণাটিকে ছুঁতে গেলে ভাষাটিকে নয় শব্দটিকে নয় বরং সংবেদনটিকে উপলব্ধি করতে হবে। ‘বয়ে যাওয়া’’ বাক্যদ্বয়ের দ্যোতিত ব্যঞ্জনায় পাঠক হয়ত কান পাতলেই শুনতে পাবেন কিভাবে বাস্তব আর পরাবাস্তবের মাঝে আমাদের আপন অস্তিত্ব অনির্ণেয় অসংখ্য তর্জমায়িত হয়ে চলেছে।

পাশাপাশি পরের স্তবকে ‘‘শ্যাওলা পড়ছে রোজ’’ এবং ‘‘রোজ শ্যাওলা পড়ছে’’ পংক্তিদুটির প্রসংগে আসি । প্রথম পংক্তির ক্রিয়া পদ পরবর্তী পংক্তিতে গিয়ে যখন বিধেয় বিশেষণে পরিণত হচ্ছে তখন বাক্যের ভেতর পূর্বসংস্কার ছিঁড়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। ‘‘শ্যাওলা পড়া’’ শব্দটিকে যখন একটি ক্রিয়ার আকারে ধরা হল তখন তার মধ্যে একটি গতিময়তা ছিল একটি রোজকার বেড়ে ওঠা ছিল কিন্তু যখন তাকে বিধেয় বিশেষণে বন্দী করা হল পরবর্তী পংক্তিতে তখন তার মধ্যে গতিময়তা কমতে কমতে একটা সমতা একটা অনিবার্যতা চলে এল, এ সেই জ্যামুক্ত শূন্যতা যেখানে রোজ রোজ জীবনযাপনের প্রহর গোনা নেই প্রশ্নোত্তর নেই, সেখানে কালসিন্ধুর ওপরের ওই শ্যাওলাকে আমরা মানতে শিখে গেছি । কারণ এই সীমাহীন সময়ের মাঝে আসলে যা আছে তা এই শ্যাওলারই অনন্ত দ্বন্দ্ব আর একে অতিক্রম করতে পারলে শূন্য শূন্য শূন্যের সেই আর্দ্র অঙ্গন। হিমেনিথ বলতেন সাধনা যদি করতেই হয় তো নগ্ন কবিতার সাধনা হোক, এ নগ্নতা আসলে সুস্পষ্ট বাস্তব আর সুবিশাল সত্তার প্রতিনিয়ত অনিশ্চিতির পরের পরিপূর্ণতম মুর্হুতটিকে চিনতে পারার নগ্নতা। হিমেনিথের সেই অনুপম গাধা প্লাতেরো যাকে নিয়ে তিনি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পৌঁছে গেছেন, যে একমাত্র তাঁর চেতনাকে বহন করেছে আর যাকে নিয়ে জীবনের প্রতিটি আলোছায়ার ভেতর থেকে কবিতাশরীর তুলে এনেছেন সেই প্লাতেরোর মৃত্যু হল একদিন আর হিমেনিথ লিখলেন - ‘‘প্লাতেরোর শরীরের নরম লোমগুলো এখন ঠিক যেন পুরনো একটা পুতুলের পোকায় খাওয়া চুল, স্পর্শ করলেই দুঃখে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। নিস্তব্ধ আস্তাবলের ভেতর সুন্দর একটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট জানলা দিয়ে ঘরের ভেতঁরে সূর্যরশ্মি, উড়তে উড়তে যখনই প্রজাপতিটির গায়ে রোদ এসে পড়ছে, তখনই তার ডানায় ডানায় নানা রং ঝিলিক দিয়ে উঠছে।‘‘ - হিমেনিথের প্রসঙ্গ আনার একটাই কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যেকার তৃতীয় আয়তনটিকে ধরতে চাওয়া। একটি না-থাকাকে দ্বিতীয় একটা থাকা দিয়ে হিমেনিথ যেমন সৃজনশীল সংঘাত করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি জানতেন যা চোখে দেখা আনন্দ তার মধ্যেই একটা চিৎকার একটা আর্তনাদ হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে, ঢুকছে একটা শূন্যতার ঘূর্ণাবর্ত আর এই শূন্যতাকে আপন করতে পারলেই তা হবে আকাশের অনুভব। গীতা অনুযায়ী এই সেই অবস্থা - ‘‘যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি/তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ’’- অর্থাৎ জীবনতরঙ্গ থেকে সে মুর্হুতে কবিতার ওই দ্বিতীয় স্তবকের শ্যাওলা দেখা শ্যাওলা চেনা শ্যাওলা সরানোর মত মোহগুলি সম্পর্কে উদাসীনতা আসবে, শ্রুত ও শ্রোতব্যের উপর স্পৃহা চলে যাবে, যেভাবে ফুল সূর্যের দিকে দল মেলে দেয় সেভাবেই তো –‘‘আকাশের বর্ণমালা শিখে যাবে’’ প্রাত্যহিক নামের এই অ্যাকোরিয়ামে থাকা মানুষরূপী বন্দী মাছগুলো। আমার মনে হয় শুধু কবি বা শিল্পী কেন সমস্ত মানুষেই জড়িয়ে থাকে এই উপনিষদীয় মাছগুলো, নিত্যদিনের শ্যাওলা ধরা কুয়োর পাড়ে ধাক্কা খায় আর একদিন খুঁজতে শুরু করে খোলস ছাড়ার খসিঘর ভাসাবার জলরাশি। অর্থাৎ দ্বিতীয় পংক্তির ওই শ্যাওলাই যেমন মানুষকে জীবন প্রবাহের বদ্ধতার পাশে এসে বসতে আহ্বান করছে আবার ওই শ্যাওলাই মুক্ততার স্রোতধ্বনি চিনিয়ে দিচ্ছে। এ কবিতা কিন্তু প্রাণের কাছে বসেই শ্বাস ছাড়া আর

শ্বাস টানার মাঝেই লেখা, এবং এ কবিতাতে যে শূন্যবাদের কাছে সমর্পণের কথা উঠছে তাকে আমি আত্মবাদ বা দেহবাদ থেকে মুক্ত করে অনন্তবাদে হয়ত পৌঁছাতে চাইনি বরং স্রেফ বোধ থেকে নি- বোধে অর্থাৎ নি অর্থে অন্তরের গহীন গভীর বোধের বুনন আকার অবধি কাটাকুটি খেলেছি।

কবিতার কোথাও শেষ থাকে বলে আমার মনে হয়না কেবল নতুন করে শুরু হওয়ার মত একটা নাতিস্পষ্ট প্রান্তরের সবুজ থাকে। ওই 'সরল ঝর্ণা' অবধি যে পৌঁছোতে পারিনি আর জীবিতকে ধরিয়ে দেওয়ার মত সাহসও যে কুলোলো না সে আমি জানি, তবে কি এ কেবল এক প্রতীক্ষা ! জীবনের বিশালময় দ্বন্দ্বতার সঙ্গত নকশা ! প্রচলন থেকে পরমে যেতে এই প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিই বা করতে পারি। এই প্রতীক্ষার ব্যঞ্জনসংঘাতে আসলে একটি মিশ্র সুর যা একদিকে জড় পরমাণু থেকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মথিত তো অন্যদিকে নিঃশব্দে ওই জলে প্রবেশ করার আনন্দ। যখন লিখি - ''দুটি হাঁস... হরবোলা ফেলে যায়/ একটিই ঘুম থেকে উঠে'' , তখন জানি এ এক অবান্তর মোহ, কিন্তু এই অবান্তরতাতেই যে পেয়ে বসে। এই ভূমি ও ভূমার হরবোলাগুলিই হয়ত খুব আস্তে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিল- তোমার কি? এই ভীড়ের মাঝে 'তুমি' নামের যে মানুষটা সে তো একটা ধারণা, তাকে দাঁড় করানো রয়েছে সরল ক্ষুধা বীজ আর বীজাণু দিয়ে। এই তুমি কে তুমি অস্বীকার করব কি ভাবে? চোখ খুলে দেবে কি ভাবে? একজন কবিও জানে –''আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ/ গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা'' কিন্তু তিনি যে এও জানেন কিছু উদ্বৃত্ত আছে, আছে কিছু ''অচেনা স্বদেশ'', আর সে তাই বারবার ঘর ছেড়ে খোঁজে সেই দেশ, প্রথমে পৌঁছোতে ওলোটপালট করতে থাকে চারিপাশের প্রাণ ও প্রচুরতা। নন্দলাল বলতেন - ''শিল্পী হয়তো দেখলো গাছের তলায় একটা লোক বসে আছে; ভালো লাগল, তার পর ছবি আঁকতে গিয়ে একটা কুঁড়েঘর তার সঙ্গে জুড়ে দিলে বা গাছের পাতাগুলি ধরে ধরে আঁকলে বা আকাশের মেঘে রঙের বাহার দেখাতে গেল ; ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হল । ছবি নষ্ট হল।''- আর আমি তো জেনে বুঝেই ছবি নষ্ট করতে চেয়েছি, এই যে চেনা চেনা প্রতিদিনের ছবিটা তার স্থায়ী রংকে ছুঁতে মানুষের মিথ্যে বার্নিশটুকু লাগিয়েছি আর তারপর তাদের তুলতে চেয়েছি চান দিয়ে দিয়ে গান দিয়ে দিয়ে যাতে সে শেষাবধি চেতনার মঙ্গলচিহ্ন হয়ে উঠুক। চেয়েছি তার শূন্যতাময় তন্দ্রা ভাঙ্গাতে ।

যেকোনো কবির কাছেই তার নিজস্ব সৃষ্টির অভিজ্ঞতা ব্যাখায় যে অসুবিধা থাকে তা হল কবির কাছে সাহিত্যজিজ্ঞাসা মানেই সেখানে আত্মজিজ্ঞাসার একটা বৃহত্তর পরিসর খোলা থাকে। তাই হয়ত কবি নিজের কথা বলে নিজের বিশ্বাসের হাওয়া দোলায় কিন্তু কোথাও সেখানে ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিকে যাওয়ারই এক আর্তি থাকে, আকুতি থাকে ক্ষণকাল থেকে চিরকালের। আর তাই সে কবিতার মধ্যে দিয়ে শেষমেশ কম্যুনিকেট করতে চায় একজন আমি- র সাথে একজন তুমি- র, সময়সীমাকে পেরিয়ে শাশ্বতকে ছুঁতে চায় তার চেতনায়, জলকে পেরিয়ে পৌঁছোতে চায় ভেসে যাওয়ার বিভঙ্গটুকু অবধি। বোঝাতে চায় একজন মানুষ যে তার পূর্ব দিনের শুকনো রঙের ওপর পরের দিনের জল ঢেলে আঠা মিশিয়ে ভালো করে আঙ্গুলে মেড়ে রোজ রোজ নতুন করে নিল সে জানল কিনা প্রত্যহ মাড়া হয় বলে যেমন রঙ মোলায়েম হয়ে যায় তেমনি তরঙ্গায়িত আয়ু আর জীবন মৃত্যুর যে ছবি ধুতে আমরা প্রত্যহ যে জলের কাছে এসে ঝুঁকছি সে আসলে ঘুমিয়ে আছে, একদিন জেগে উঠে হয়ত ছুঁয়ে দেবে মানুষের চিরন্তনীয় অভাব মেটাতে, আর আর্দ্রতা ছুঁতে ছুঁতে সেদিন হয়ত মানুষও সত্তাপরিশুদ্ধ এক মাছ হয়ে যাবে।
কে জানে ! . . .

স্বকাব্যকথন

টিঙ্কার বেল — পৃথিবী থেকে না- পৃথিবীর দূরত্ব যতখানি

দেবাদৃতা বসু

১ |

একটা ড্রিমের ভেতর বসে আছি লুকিয়ে। এরপর সকাল হবে। সময়কণার চলাচলকে কেন্দ্র ক'রে ক্যাপ্টেন হুকের জাহাজ সামান্য দুলতেই শোনা যাচ্ছে ব্যাপারীদের বিভিন্ন আওয়াজের দুর্যোগ। কাঠের পাটাতনটা ফুরোলেই বাজার। কাঠের দরজার তলায় যতটুকু ফাঁক, তার আন্দাজে শরীরটা বড়। ওই ফাঁকটুকুই আপাতত সম্বল— গন্তব্য, পরিত্রাণ এবং কোলাহলমুখর। কোথাও একটা নিষিদ্ধ ঘড়ি টিক টিক করছে আর আমি ভাবছি কি ক'রে লুকিয়ে থাকা যায় আরও কিছুক্ষণ। কেউ যেন দেখতে না পায় আমাকে। অথচ এরকমভাবে ভোর হতো এক একটা স্বপ্নের খোঁজে। মূলত শীতকাল— লেপের তলাটা সুবিধা

মত সাজিয়ে নিতাম । এমনভাবে একটা সিমুলেশান, যেন বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগসূত্রগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে আসা বাসন ও জলের বিনিময়ে যে আওয়াজ— মনে হতো পাইরেটদের হর্ন আর হর্নবিলের ডানার ঝটপট। অনেকটা এপার জুড়ে এই ল্যান্ডমাস। প্যানের সাম্রাজ্যে কেউ বড় হয় না কখনো, একমাত্র টিঙ্কার বেল ছাড়া। এত রঙ আর এত গন্ধ, পথ হারানোর ম্যাজিকটাই কবিতা হয়ে ওঠে। ওই যে বেসামাল একটা বৃহৎ ডিনার টেবিল, ভ'রে উঠছে কাল্পনিক খাবারে আর তার পাশেই একটা পৃথিবী, যার সমস্ত হ্রদ এবার আয়না হবে। পৃথিবীর প্রথম আয়নগুলোর জন্ম এখানে। ঘড়ির কাঁটাগুলো ঘুরতেই থাকে, টান পড়ে ঋতুচক্রে, শুধু বয়স বাড়ে না। অন্ধকার হলে টিঙ্কার বেল ডাকে, "lost boys, lost boys, dinner is served"।

প্রকাণ্ড ওই সিমুলেশানের ভেতর থাকতে অভ্যস্ত হয়ে তখন মনে হত এক দস্তানার কথা। ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে তার গহ্বর এবং বাড়ছে সংসারের সদস্য। আমি ভাবতাম যদি ওদের মত ওদের সাথে থাকা যায়। আর আমার শীতের লেপ, কম্বল, বালিশ মিশে যেত ওই প্ররোচনায়। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লেই টর্চ জ্বেলে দেখতাম কেউ কোথাও আছে কিনা। বরং টর্চটা নিভিয়ে দিলেই দেখা যেত ওদের বেড়ে ওঠা, সংসার, ওদের ড্রামা— কমেডি, ট্র্যাজেডি। ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের মত সহজ ও অদৃশ্য। তখন ভাবতাম সকাল হবে। অহেতুক আর যেতে হবে না স্কুলে। ঘুম চোখে লেপটা সরালেই দেখা যাবে ওই বাগান, অতিকায় জলাশয় আর ছোট ছোট র‍্যাবিট হোল। একটা এমন জায়গার কথা লেখা হবে যেখানে প্রতিদিন শহর এসে মিশে যেতে থাকে সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে রাখা ঝর্ণায়। মানুষ তো এভাবেই অমরত্বের কথা শিখেছে, তার ধান, গম, আস্তাবল, হাতি, ঘোড়া, ফসল ফেলে রেখে বারবার ফিরে গেছে অরণ্যে ।

জরায়ুর ভেতর নড়াচড়া করছে শব্দরা। ‘sl i p’ করছে। বিটস এবং পিসেস সমেত পৃথিবীর সমস্ত শব্দ, কোল মাইন, পরিত্যক্ত জাহাজ ঘাট, নোনা হাওয়ার গন্ধ, ঈষৎ আর্দ্র অনর্গল বেরিয়ে পড়ছে ফ্যালোপিয়ান টিউব বেয়ে। এদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকাগুলো নিয়ে সভ্যতা হবে। শুধু নির্মাণ নয়, সারি দিয়ে অগুনতি পিরামিড হয়ে উঠবে এলিয়েন স্পেসশিপের ল্যান্ডিং প্যাড। কখন সময়কে ফাঁকি দিয়ে লেখা হবে ইতিহাস। এইভাবেই সময়কে ফাঁকি দেওয়ার নিয়মে ফিরে যাওয়াগুলো থেকে যায়। রিডিং ল্যাম্প থেকে মাথা তুললেই দেখা যেত অসংখ্য ভাষার কাটাকুটি খেলা। জানলার বাইরে আরও একটা রেইনি ডে বদলে দিচ্ছে লিখে রাখা ইতিহাস এবং ইতিমধ্যে, সমস্ত ঘড়িগুলো কখন যেন আমার হয়ে গেছে।

চাঁদের হাফ
পড়ে থাকছে আর ফোঁটা ফোঁটা ঘুম নামে জড়িয়ে
উম্বের পিছলে থেমে প্রাচ্যের নৌযান

রেইনি ডের জন্ম থেকে তুলে আনো
যতি চিহ্ন
আর দোলনাটা দুলতেই থাকুক একটা ঘুমের উদ্যোগে।

২ |

হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে কোথাও ঝড় উঠেছে খুব। বরফ উড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো। জোনাস! জোনাস, তুমি তো জানতে এই ঝড়ের পূর্বাভাস। এর মধ্যেই উষ্ণ গন্ধ পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ আলো। প্রায় শ্বাসরোধী তার সৌন্দর্য। গোটারাত দাঁড় টেনে ক্লান্ত জোনাস দেখতে পায় একটা ক্যাসেল। গথিক ক্রুসিফরম। তারপর মাঠ। ছোটবেলায় ওই মাঠকেই অন্তহীন মনে হত আমাদের। সুড়কির দেওয়াল থেকে আর একটু পেছনে মাথা হেলিয়ে কড়িকাঠ। দরজার ওপর সারাদিন অবিরাম ডেকে যাচ্ছে পায়রাগুলো। এক একটা করিডর দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে প্রত্যেকটা বাঁকেই চমক এবং গোপনতা। দেওয়ালের গা দিয়ে একটা স্পাইরাল সিঁড়ি, প্রত্যেকটা বাঁক শেষ ক’রে নিচে তাকালে পৃথিবীটা আরও কিছুটা অন্যরকম লাগত। সিঁড়িটার শেষে একটা লাইব্রেরী— যেমন সিনেমায় দেখা যায়— মিডিয়েভ্যাল, কোনও চার্চ বা নর্থ ইংল্যান্ডের এক টুকরো জীবনযাত্রা। এই ঘরেই প্রথম আলাপ ওদের সাথে। পুরনো হার্ড বাউন্ড বই, স্পাইনে হাত দিলে ঘাড়ের কাছে কেমন যৌন অনুভূতি হতে থাকে আর গন্ধ, এতই তীব্র, ন্যাপথালিনের গন্ধকেই বহু বছর বইয়ের গন্ধ ভেবে ভুল করতাম। তারপর এমিলিয়া জেন, থাম্বেলিনা, বেয়ার স্কিন, পিনোকিও। স্কুল ফেরত, চোখ এড়িয়ে একদিন ম্যাডক্স স্কোয়ারের মাঠে একটা চৌকোনা স্ট্রাকচার ছিল। খরগোশের মত মুখ লুকিয়ে জীবনের প্রথম চুমু খেতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, উমম, এই তো, প্রিন্স চার্মিং ।

দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য হাতের ছাপ। একটা মোড় ঘুরতেই বিশাল দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে জোনাস। কোমরবন্ধ থেকে খুলে নি চাবির গোছা। দরজাটা খুলে গেলে জোনাস দেখতে পাবে একটা পরিত্যক্ত বনাঞ্চল। হাতে ধরা বিশাল ভারী এবং বড় লোহার চাবিটা মাটিতে নামিয়ে রাখবে।

এভাবেই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। অনেক পরে বই পড়ে জানতে পারি condensation এবং displacement এর কথা। (Interpretation of Dreams, Sigmund Freud)। ওই ঘরটা এতটাই বড় অনায়াসে একটা ফুটবল ম্যাচ হতে পারে ওখানে। রাত হ'লে একে একে সবাই নেমে আসতে থাকে ওই তাক-আলমারি বেয়ে। ডুয়েলের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে মাঠের ওপার পর্যন্ত, তারপরেই একটা ঘুমন্ত শহর চিরে চলে যাবে হলুদ কালো ট্যাক্সি, ২২১ বা ২৩৪ বাস। ছোট্ট একটা ফায়ার প্লেসের ধারে বসে অপেক্ষা করছে রাম্পেলস্টিলস্কিন। সকাল হওয়ার অপেক্ষা, কিন্তু সকাল হলেই গোটা ঘর ভোরে যাবে । ঘর ভরা শিশুদের কোলাহলে রাম্পেল খুঁজে বেড়াচ্ছে রানীর ছেলেকে, হতাশ হচ্ছে। চিৎকার করছে :

"To-day I bake, to-morrow brew,
the next I'll have the young queen's child.
Ha, glad am I that no one knew
thatRumpelstiltskin I am styled."

এই তো! এমন কঠিন এক নাম, কেউ আন্দাজ করতে পারল না। আমাদের পরিচিত শব্দের নিয়ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে একা একা বেঁচে থাকে রাম্পেলস্টিলস্কিন। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। অনন্ত ফিসফিসের মধ্যে রাত হ'লে সে আবার অপেক্ষা করবে আরও একটা সকালের। ওর মত আমিও অপেক্ষা ক'রে থাকতাম। চুল কাটা নিয়ে প্রতিবছর একই মনোমালিন্য। চার্চ টাওয়ারের একদম ওপরে একটা ঘর ছিল রাপুঞ্জেলের সাজঘর। চুলটা আর একটু বড় ক'রে ঝুলিয়ে দিলেই হল। নিমেষে সাদা ঘোড়া, ড্রাগনের মিথ সব সত্যি। সত্যিই তো। শুধু চাবিটা প্রয়োজন। ঘুমের মধ্যে এপাশ ওপাশ ক'রে তখন রোজ আদর করছি, আবদার করছি স্নো হোয়াইট, সিন্ডারেলাদের। আর ঘুম ভাঙলেই টের পাচ্ছি একে একে জেগে উঠছে শহর, বাটার দোকানে কাঁচের জুতোগুলো সব বিক্রি হয়ে গেছে, বুলরুমে চূড়ান্ত ঘণ্টাটা বাজল ব'লে, এদিকে উচ্চতা বাড়ছে না ব'লে কিছুতেই হাত পাচ্ছি না চাবির বাক্সটায়।

ঘুমন্ত ফিতের থেকে
খোলা রাজকন্যার শরীর, মাংসের গায়ে সেই শীত

বাড়ি ভরে পুরনো পাতা
রেকর্ড ভেঙে যে টুইংকেল
তাদের স্টার নিয়ে অপেরা হাউস রোলকল
করছে সমস্ত তারকাদের ডাকনাম

গুঁড়ো মাংসের ওই রূপকথা
পর্দা ওরায় অদিম টিকিট চেকার ।

উচ্চতা বাড়েনি। তাই পথ দেখানো হয়নি জোনাসকে। এমনকি রাপুলজেলের ব্লন্ড বা সিন্ডারেলার ব্রুনেট নিয়ে আমার এত আদর গোছাতে গোছাতে টের পাচ্ছি রাম্পেলের একাকীত্ব। শরীর থেকে এত আওয়াজ উঠে এলো, মাংসের বিনিময়ে, যেন সমস্ত নিয়মকে মকারি করতে করতে দেখতে পাচ্ছি টিকিট কাটা হয়নি বলে ট্রেন চলে যাচ্ছে আমাকে ছাড়া। Accretion disc- এর মত চলমান অন্ধকার আমাদের ।

৩ |

Wolfgang Amadeus Mozart কে নিয়ে Milos Forman এর সেই সিনেমাটা মনে পড়ছে কেন? ছবিটার একদম শেষ দৃশ্য অ্যাসাইলামে। সারাজীবন ঈশ্বর এবং মোজার্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে আন্তনিও সালিয়েরির ডায়ালগ, "Mediocrity, I absolve you.".

"রেললাইন থেকে উঠে আসা মানুষ
ছুঁলেই ট্রেন হয়ে ওঠা যায়।

দস্তানার
সংসারে একটা অসুখ হোল

সেলাই মেশিনের অন্যদিকে যে দুঃখ
তাতে বৃষ্টি পড়ছে"

Freudian displacement- এর মজাটাই তো ওইখানে। তোমার চেনা, তোমার পরিধির সবকিছুই যখন তখন বদলে যেতে পারে, থাকে। থাকে। প্রতিদিনের ওই স্কুল যাওয়ার বদলে একদিন চোখের সামনে একটা বীচ। লোকালরা ফুটবল খেলে এখানে। শীতল পাথরের চার্চগুলোর নিস্তব্ধতার বদলে চিৎকার। "গোওওওওওওওওওওওল"। এ দেশে ধর্মের নাম ইগ্লেসিয়া মারাদোনিয়ানা। এত রঙ আর গন্ধের condensation। এই যে বীচ ধরে হেঁটে যাচ্ছি, হেঁটেই যাচ্ছি এত কবিতার মধ্যে। একটা জঙ্গল ছিল, লম্বা, মোটা মোটা গাছের ঝুড়িতে দোল খেত পাখীরা, আর শিস দিত। আবার কত রঙ— পাতার, পালকের। আর এই যে সেই ছোটবেলার হাঁটা এখনো থামেনি, এর মধ্যেকার সব গন্ধের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে রেইন ফরেস্টে প্রবল বৃষ্টির গন্ধরা। জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও সূর্য ডুবছে। একটা কালো সাদা বল এসে ড্রপ খেয়ে স্থির হলো ক্লিয়ারিঙয়ে। বলটা হাতে নিয়ে মাথা তুলতেই দেখা যাবে একটা মেলা বসেছে। রঙিন মোরগের লড়াইতে হাজার হাজার পেসো উড়ছে আকাশে। গভীর নীল আলো থেকে উঠে আসা ইউজিন। ওর চোখে সভ্যতার আয়নায় লেগে থাকা স্লেজ গাড়ি ।

‘‘সৈনিককে সমুদ্রে ভাসাতে গিয়ে থেমে গেলো যুদ্ধ
জাহাজের চাঁদ লটারি
খেলতে গেছে ভাঙ্গা মানচিত্রে ।
ওদের এখন একটাই ভাষা
যেখানে আকাশ মানে ছুটির দিন
আর ছুটির কথা ভাবতেই থেমে যায় গোটা মহাদেশের ঘড়ির কাঁটা।’’

একটা ফুটবলের জীবন। প্রতিটা মুহূর্ত চূর্ণ হওয়ার আগেই পয়েন্টচ্যুত হওয়ার ভয়। যদি displacement- গুলো একমুখী হ’ত তাহলে এই লেখাটা হয়ত লেখা হ’ত না কখনো। নেশা হোক বা ইন্সমিয়া, একটা আধা চেনা ঘরের জানলা দিয়ে খুব ভোর হচ্ছে। ওই পয়েন্টটাই রিয়েল, একমুখী ব’লে ভ্রম হয় সাময়িক। শব্দগুলো তো choice, অথবা ধরা যাক syntax, ওই ভ্রমের মধ্যে শরীর বড় হয়ে ওঠে, ছুটির দিন লেগে থাকে গায়ে আর অনায়াস জাগ্লিং হয়, একইসাথে condensation এবং displacement। এমন একটা জার্নি যেখানে শুরু আর শেষের বিন্দু মিলতে পারে না। ফুটবলের ওই অসামান্য পাসগুলো, কাটিয়ে কাটিয়ে তুমি জোনাস, নিয়ে যাচ্ছ গোলপোস্টের দিকে। প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে বল ও গোলের মাঝের দূরত্ব। দুটো পাসের মধ্যবর্তী যে অঞ্চল— ওখানে তোমার টিঙ্কার বেল ঘুমিয়ে আছে অজস্র স্বপ্ন ও বাস্তবের

স্বকাব্যকথন

অলি গলি
জয়শীলা গুহ বাগচী

ঠিক একশো পাতার একটা অঙ্ক কিম্বা একটা অসীম বিনুনি । এইভাবে যদি বলা যেত সোজা হত । কিন্তু তা কি হয়! প্রত্যেক শব্দের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বহুত্ব দেখতে দেখতে নিজের বলা প্রত্যেকটি কথাই অসম্পূর্ণ এবং অর্থহীন মনে হয় । এইভাবে একদিন সাবজেক্ট হারিয়ে ফেলে একা দাঁড়িয়ে থাকি ভিড়ে। একা শব্দের মিথ্যে নাকি ভীড়ের ছদ্মবেশ কোনটা ঠিক জানি না। একা একটা মিথ। যার ভেতর আবছায়া একটা বারান্দা আছে। সহজেই অনুবাদ করা যায় এমন কিছু চিরাচরিত সংকেত আছে ।

কীভাবে হারিয়ে গেল রাস্তাঘাট কিম্বা আমি ..... তার চেয়েও বড় কথা কি কি পাওয়া গেল । যেমন ধরা যাক এই মুহূর্তের পেনটি । এর তীব্র নীল রঙ জানান দিচ্ছে সে আছে । এই থাকা ঘটনাটি তো শুধু রঙের নয়, শারলি এবদোর রঙ পেন্সিলও নয়, তার থেকেও বড় হতে থাকে এর ছায়া ।

একটা গরমের রাতও অনেক বেশী, অনেক ঘনত্ব তার । কোটি কোটি ঘুম আর আর নির্ঘুমের শ্বাসে ভারী হয়ে আছে প্রত্যেক পাতা । একটা সময়ের মাঝে তৈরি হয় কত লক্ষ কোটি সময়ের একক । প্রত্যেকে তার নিজের মত । আমার জেগে থাকা মাঝরাতে যত স্তর তৈরি হয় দেওয়ালের ওপাশের ঘুমন্ত মানুষটি অবচেতনে হয়ত তৈরি করছেন আরও অনেক বেশী । যে কুকুরটা চিৎকার করছে এখন ওরও এটা সময়। একটা কুকুরও নিজের অবস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। তুতেন খামেনের কুকুর এসে উঁকি দিয়ে যায় মহাপ্রস্থানে। পলি জমে জমে ডাঙা । ডাঙায় উঠে বসে কুমীরের ফসিল । সেই সঙ্গে চাপা পড়া শংকরাচার্য ক্ষমার ভঙ্গীতে যদি বলে ওঠেন ..... এ জগত মধুময় ..... ওদিকে আর এক তলে ককিয়ে ওঠে দৈনন্দিন । ডাবর হানির অ্যাড । মধু শব্দটা পড়ছে সোজা । যেখানে পড়ছে তৈরি হচ্ছে হরেক রকম নক্সা । প্রত্যেক মুহূর্তের অভিঘাত কত আলাদা । একই মধুর পতন, কত রকম ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে বাচালতা ।

যে দেখছে উল্টোদিকে, তার বা তাদের দৃষ্টি জন্ম দেয় আলাদা আলাদা কবিতা সম্ভাবনার । একই মধু, একই পাউরুটি, একই ফ্রেম, একই সময়তল । তবুও কেউ দেখলেন নক্সা, কেউ পড়তে থাকা ধারা, কেউ চামচ । কখনো সাবজেক্ট প্রধান, কখনো অবজেক্ট, কখনো কেউই প্রধান নয়, কখনো দুজনেই প্রধান। কারুর কাছে গোটা ফ্রেম, কেউ বা শুনলেন সুর । অথচ এই আয়নাকে যেভাবেই বসানো হোক না কেন ...সামনা সামনি, পাশে, নীচে, উপরে, পেছনে ... কতরকম বার্তা তার । সাবজেক্ট সরে গেলেও কোন অসুবিধে নেই, বরং সেটাই সুবিধেজনক তখন শুধু একটা ফ্রেম। খুশী মত তৈরি করা যাচ্ছে তল। অসীম সম্ভাবনা গড়ে উঠছে । অথবা ভেঙে যাচ্ছে । এই একই ফ্রেম তৈরি করে জীবনানন্দ কখনো চাঁদ কে ভাসাচ্ছেন, কখনো বেহুলাকে, কখনো নিজে । কখনো ফ্রেমই চরিত্র হয়ে কাঁদছে বেহুলার জন্য । কিন্তু ফ্রেমও অপরিহার্য নয় । কবিতা শুধু কয়েকটি শব্দকে আশ্রয় করে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাতের মত নিঃশব্দ হয়ে ওঠে । সেই শব্দের গঠন তত্ত্ব নাও থাকতে পারে । না থাকতে পারে লনওয়ালা বাড়ীর সুনির্দিষ্ট রোদ। প্রতিটি পাঠে পাঠ্য গড়ে ওঠে নতুন ভাবে। শব্দের বিচ্ছুরণ পাঠ অনুযায়ী তৈরি করে আলাদা আলাদা আবহ। একটি ফুটবল মাঠ যেন। বল পায়ে পায়ে ঘুরছে । প্রত্যেকের আলাদা স্কিল । জমে উঠছে নতুন নতুন ভাষ্য । এই খেলাটা শেষ হয় না । রেফারীর বাঁশী নেই । মাঠের সীমারেখা মুছে গেছে । প্রত্যেকের নিজস্ব যাত্রা শুরু হয় সম্ভবত এই ধারণা দিয়ে । একটি বিষয়ে একাধিক সত্য আমাদের জ্ঞান কে করে অসম্পূর্ণ । অসীম সংখ্যক ব্যাখ্যা আমাদের অবস্থান কে করে অনিশ্চিত ।

কিশোরী বয়েসে মা বলেছিল, ‘‘শেষের কবিতা’’ নানা বয়েসে পড়লে তার ভাষ্য পালটে যায়। সেই থেকে একটি ভাষ্যে অবিশ্বাস জন্মাল । চারদিকে দেখা গেল আয়রনি, আক্সনি, আয়রনি । কে কার নিয়ন্ত্রক ? শুধু কল্পনা করা যেতে পারে আমার নিয়ন্ত্রণ আমি করছি কিন্তু ডিম থেকে যে পাখিটির জন্ম হয়েছে সেটি মিথ সরিয়ে, গল্প সরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অনন্তের দিকে . . . . . .

জোনাকির পাখায় উৎসবের আলো
চুমু গন্ধ হয়
লক্ষ লক্ষ ঘুম বছর
বয়ে যায় ঘূর্ণিতে
খুলতে থাকে জল
স্নায়ুর ভেতর জন্ম বেজে ওঠে

অস্বীকার উঁকি দিলে
কেঁপে ওঠে বীজ পর্যন্ত বাতাস
নেত্রনালি থেকে শিশু ঝরে
সাপটে জাপটে নেয় অনন্ত কাল

স্বকাব্যকথন

ঝরাপাতা জমছে ডাকঘরে

দেবযানী বসু

যুগলাট্যমে বৃষ্টি ও শিলা নাচেনি বহুকাল। পশলা পশলা খবরে মহিলা আগুনে পাহাড়দের কথা উঠে আসছে। কোনো গ্রহে সমাজ নেই সমাজে কবিতা বলে কিছু নেই আর। কোনো কোনো মজার দেশে নারী নেই। অপুদুর্গা যে ট্রেনটি দেখবে বলে ছুটে এসেছে তার চালকটির মাথা নেই । ঘুঘুভুক মানুষদের অন্ত্রে ঘুঘু বাসা বাঁধতে পারেনি। আজও অজানা যৌথস্তরের ভিতপুজো কবে শুরু হবে।

(অ্যান্টি গ্রে ম্যাটার – ৫, কবিতাবই ‘‘নোনামিঠে জলচিহ্ন’’)

কবিতাটির ভাষ্যকার আমাকেই হতে হবে। অর্থাৎ নিজের ভিতরকার মোরগযুদ্ধটাকে আরেকবার ঝালিয়ে নিতে হবে। স্বীকারোক্তির নরম পুতুল বানানো তুলোরা ছাড়া পেয়ে ওড়াওড়ি করবে । বলতে পারবো কোনো এক সঙ্গম সময়ে এই সব তুলো পাখি হয়ে চারপাশে উড়ে বেড়িয়েছে । আমাদের যাপন প্রণালীতে অজস্র নাচের মুদ্রা ... চলাফেরা চমকে তাকানো সব কিছুতেই নাচের মুদ্রা ও মুহূর্ত তৈরি হয় । কবিতাটা লেখার সময় করে রাধা, রাজা, কৌশল্যা রেড্ডীর কুচিপুড়ি নাচের ওপর একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম । তাদের নৃত্যভঙ্গিতে আছে মোহিনী আট্যম নামক একটি পর্ব । এই শব্দটি থেকেই যুগলাট্যম শব্দটির সৃষ্টি। নিজেদের শিল্পজীবনকে উন্নতিশীল করে রাখার জন্য এই ত্রিকোণ সম্পর্ক যে উর্ণাতন্তু বুনে তুলল এর বিস্ময়কর দিকটি আমাকে নাড়া দিয়েছিল । আমি অনুপ্রাণিত হলাম । তার মানে এই নয় যে সেই প্রেরণা আমাকে দিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ধরণের কোন কবিতা লিখিয়ে নেবে। অপর এবং নতুন কবিতা লেখার খাতিরে কবিতা শরীরের প্রতিটি মুহূর্তকে উজ্জল করে তুলতে হয় । চেতনা ও ভাষা সমান্তরাল ও বিপরীত পথে উড়ে যেতে থাকে । তাকে কেলাসিত করে পরিবেশন করা অথবা একের পর এক স্নাপ তুলতে তুলতে এডিট করে যাওয়া আমার কাছে জরুরি মনে হয়। ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পীদের

ব্যক্তিগত জীবনটি এখন মিথ হয়ে আছে । আমি বা আমার জীবনের কেউ না কেউ বৃষ্টি অথবা শিলা ... আমরা নৃত্যের মতোই গতিশীল যৌনতাময় করে তুলতে চেয়েছি জীবনকে । রাধা ও কৌশল্যাদের মতো মহিলা আগুনে পাহাড় হতে চেয়েছি । দর্শন ও অর্থনীতি বলে মানুষের চাহিদার শেষ নেই। মানুষ হিসেবে তার আর্থ- সামাজিক পরিবেশের কোথায় দাঁড়িয়ে আমি কবি সেটা তো অনির্ণেয় । কবিদের প্রজাতন্ত্রে আমি মিলেমিশে আছি। জানি "মেয়েদের প্রজাতন্ত্র" ঘরে বাইরে এখনো বিপজ্জনক অবস্থায়। মানুষ পণ্য তন্মধ্যে নারী পণ্যতমা । ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবী জুড়েই বোধ হয় ব্যর্থ কবিদের হ্রস্ব ও দীর্ঘ শ্বাস । প্রতিভার ও সুযোগের অবরুদ্ধ দেয়াল। আসলে কবিতার জগত চিরকাল রয়ে যায় অবগুণ্ঠনময় । সাফল্যের উলটো পিঠে হতাশা । মাঝে মাঝে গভীর হতাশায় মনে হয়েছে "কোন গ্রহে সমাজ নেই সমাজে কবিতা বলে কিছু নেই আজ" আর সমাজ মানে কবিদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ যা হয়ত চিরকাল ইউটোপিয়া হয়ে থাকে। রাজা রেড্ডীর বিবাহ এক ধরনের লিভ টুগেদার। খুব সাধারণ পরকীয়া থেকে একটু উন্নত ধরণের জীবনযাপন । তাদের নিজেদের ভিতরকার টানাপোড়েন গুলো প্রচুর স্বার্থ ত্যাগের পথ অতিক্রম করেছে। কিন্তু একজন মহিলা শিল্পী যদি দুজন স্বামী চাইতেন তাহলে কি হত!! সেখানে মহিলাটি পুরুষ তান্ত্রিকতার হাত থেকে কত শতাংশ ছাড় পেতেন!! বৃহত্তর সমাজের আঁকুপাঁকু নাকেহাত আই আই মাগোমাখা জীবনে শিল্পীদের স্বাধীনতা কেমন যেন পান্তাভাত মার্কা হয়ে থাকে। যে কোন ধরনের শিল্পেই জানি আদিম সম্পর্কের ভাবস্ফূর্তি বাস্তবতার তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসে। সংসারের সীমানাবদ্ধ শিল্পীদের টানাপোড়েন নিয়ে ভাবনার ফল ঐ নঞর্থক পঙক্তিটি যেখানে সামান্য বিরহের ছোঁয়া লেগে থাকে।

খবরের কাগজে চোখ রাখলে চাঁদের কালো মুখ দেখা যায় । পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম । এর মধ্যে আবার উত্তর ভারতের কয়েকটি দেশের কিছু গ্রামাঞ্চলে বিবাহযোগ্যা নারী নেই । ব্যঙ্গ করে লিখলাম "আর কোনো কোনো মজার দেশে নারী নেই" । ভাত কাপড়ের দাসি মহিলাদের প্রতিবাদ করার সাহস নেই। পুরুষ ও তাদের করতলগত কিছু মহিলাদের ষড়যন্ত্রেই এইরকম নারীভ্রূণ ও শিশুকন্যা হত্যাকারী কিছু গ্রাম মহান ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে । যে মজার দেশ নামক ছড়া নির্মল কৌতুক করে যোগীন্দ্র নাথ সরকার একবার লিখেছিলেন তা আজ নির্মম মজার দেশ হয়ে উঠেছে ।

আমার কবিতা কেন্দ্রাতিগ বলে বহু মশলার স্বাদ এক ব্যঞ্জনে পড়ে যাচ্ছে । দুম করে একটি বেমানান চিন্তার পঙক্তি চলে এল : "অপুদুর্গা যে ট্রেনটি দেখবে বলে ছুটে এসেছে তার চালকটির মাথা নেই" । অপুদুর্গা শৈশবের সারল্যের শাশ্বত প্রতীক । সারা বিশ্বেই প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নরমেধ ক্রিয়া কলাপ চলতেই থাকে । সাধারণ ভাবে যে কেউ এই ছত্রটিকে বিপন্ন শৈশবের ব্যঞ্জনা হিসেবে দেখতে পারেন। খুব সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধরত দেশগুলির শিশুদের অবস্থা ভাবুন । আমাদের ঘরে ঘরে পারিবারিক হিংসার প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হিসেবে এইসব শিশুরাই ব্যবহৃত হয় । এ রকম ভাবনায় কাব্যরসবিচ্যুতি কখনোই হতে পারে না । কিন্তু কবিতাটির রচয়িতা আমি এরকম ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজি নই । আসলে আমি একবার কবিতা লিখতে বসলাম তো প্রায় দশ পনেরটা একসঙ্গে লিখে ফেললাম তা নয়, আমার বেলায় তা হয় না । আমি রোজ একটা কি দুটো কবিতা লিখি । ঘুমে স্বপ্ন দেখা একধরনের আতিশয্যসহ অভ্যাস আমার । কিশোরী বয়সে পথের পাঁচালির সেই কাশফুল দোলানো জমির মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়া পথে টিন এজার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর কিছু স্মৃতি রয়ে গেছে । তার সঙ্গে অনিবার্য বিচ্ছেদের যন্ত্রণা ঘুরে ঘুরে আসে স্বপ্নে । এরকম একটা স্বপ্নে আমি ট্রেন লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে আছি একা। একটা মালগাড়ি আসছে ধীরে । মনে মনে জানছি গাড়ির চালকটি আমার প্রেমিক । আমি ছুটছি তার মুখটা দেখব বলে কিন্তু গলার উপর থেকে তার মাথাটা নেই । কিন্তু রক্তাক্ত নয় স্থানটি । শুকনো মাংসজোড়া । তার পরনে রেলের খাঁকি ইউনিফর্ম নয়, আকাশী রঙের শার্ট যা সে পরত আমি পছন্দ করতাম । একটা ডুকরানো ধাক্কা দিয়ে স্বপ্নটা ভেঙে গেল। আর আমি বিশাল মাপের রোমান্টিক কবি হতে না পেরে বিশাল মেটামরফিক লাভাস্রোতবাহী পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে গিয়ে শুধু লিখতে পারলাম পথের পাঁচালীর অপুদুর্গার ট্রেন দেখা সংক্রান্ত দৃশ্যটির সঙ্গে

আমার স্বপ্নদৃশ্যটিও কোথাও মিলে যাচ্ছে ।

আমি তো কবিতায় শাব্দিক ঘুঘু যারা আপাত করুণ ভাবে নিরলস ডেকে যায় মাথায় তাদের ধরে ধরে খাই । ভাবুন প্রকৃত অর্থে যারা ভিটেতে ঘুঘু চরায় তাদের হুংকার বিনাশ করা অনায়াস কাজ নয় । ঘুঘু শিকার করে যারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে তাদের মন সরল হয় । হঠাৎ করে ঘুঘু মারা শিয়ালমারার দল গ্রামে এসে পড়ত । ঘুঘুর মতো একটা নিরীহ পাখিকে প্রবাদের ঘোলাজল খাইয়ে তাদের প্রতি অবিচার করলাম আমরা । চিন্তা করুন এভাবে নিজেকে ওপেন এন্ডেড করা যাচ্ছে কিনা । তাহলে আসুক ছাপার অক্ষরে ঐ লাইনটি "ঘুঘুভুক মানুষদের অন্ত্রে ঘুঘু বাসা বাঁধতে পারে নি" । ঘুঘুকে শুধু অমাঙ্গলিক চিহ্ন থেকে মুক্তি দিন । বিনির্মাণ অবিনির্মাণের গোলোকধাঁধায় কতোটা সফল ভাবে ঘুরছি কে জানে । অন্ত্র কি মস্তিষ্কের সমার্থক হতে পারে ?

পৃথিবী গিয়েছে ভরে টোকো মদ,নৌবহর,শালপাতা,শম্ভু মিত্র,লঙ্কা ও ছোলায়

what sphinx of cement and aluminium bashed open কাব্যানালিসিস**their skulls and ate up their brains and imagination**

কবির জিজ্ঞাসা

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ও ছায়াদি
অরুণেশ ঘোষ

অস্পৃশ্য নদীর জলে একদিন গোধূলিবেলায়
নত হয়ে ধুয়ে নেব খড়্গ আমার
তুমি সেইদিন

ঝোপের আড়াল থেকে হেঁটে এসে একা
বিকেলের নদীর আলোয় মুখোমুখি একান্তে দাঁড়াবে?
অথবা পোশাক ছেড়ে ধীরপায়ে নেমে যাবে জলে
আমি খড়্গ তুলে নেব, আমি দুঃখ তুলে নেব বুকে
তুমি নগ্ন
তোমার পোশাক আমি দু- হাতে ভাসিয়ে দিয়ে যাব
তুমি একা খেলা করো জলে।

১.

একজন প্রকৃত (?) কবি তাঁর নিজের জাত চেনাবার জন্যে একটিমাত্র শব্দকেই যথেষ্ট মনে করেন বোধয়। মাসখানেক আগে, এক দুপুরে এই কবিতাটা পড়ছিলাম। প্রথমবার পড়তে গিয়ে, টের পাচ্ছিলাম কবিতার ভেতরে থাকা অসামান্য চিত্রনাট্যটা। কিন্তু দ্বিতীয়বারে, সে চিত্রনাট্য উধাও। পাঁচ নম্বর লাইন, ঐ নিতান্ত নিরীহ পাঁচ নম্বর লাইন, ‘মুখোমুখি বসিবার’ জীবনানন্দীয় ঘেঁষা উচ্চারণকে পাশ কাটিয়ে তাকে এই কালের অনিশ্চয়তায় এনে ফেললেন অরুণেশ একটিমাত্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে ! জীবনানন্দ তো জানতেন, 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার. . . ' । অরুণেশের ‘কাল’ সেই প্রি- অক্যুপায়েড, সেই পূর্ব- জ্ঞান তাঁকে দেয়নি। সংশয় দিয়েছে। ঐ লাইন হয়তো আরো অনেক কবিই লিখে ফেলতে পারেন। ‘সময়ে’র শরিকতার কারণেই লিখে ফেলতে পারেন। কিন্তু 'একান্তে দাঁড়াবে'- এর পরে প্রশ্নবোধক চিহ? এই একটা চিহ্নই যথেষ্ট কবির বুড়ো আঙুলের ছাপ চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে। কেননা, ঐ লাইনে এই চিহ্নটা শুধু সময়ের কারণে প'ড়ে পাওয়া হতে পারে না। এটা কবিকে অর্জন করতে হয়েছে। সময়ের স্তন ছুঁয়ে নাভি ছুঁয়ে। জননেন্দ্রিয়ের গন্ধ শুঁকে। ‘ঝোপের আড়াল থেকে হেঁটে এসে একা/ বিকেলের নদীর আলোয় মুখোমুখি একান্তে দাঁড়াবে’— এইখানে সাধারণ কবি আদেশ সূচক বাক্যই লিখবেন। অরুণেশ অনন্য সংশয়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, এই বাক্যকে নিয়ে গেলেন প্রশ্নসূচকে। পেইন্টিঙে ব্যালান্স ব'লে একটা ব্যাপার আছে। কবিতাটার 'খড়্গ'- এর সাথে '?'- - এর সেই ব্যালান্স, সংকেত ও ইশারা দেখিয়ে আমার মাথায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিলেন অরুণেশ।

২.

এই কবিতার ‘ছায়াদি’কে আমি চিনি না। যিনি বা যাঁরা এই লেখা পড়ছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কি জানেন এঁকে? এনাকে

আমি চিনি না বলেই চিনে ফেলার বন্দী- ফ্রেমের বাইরে গিয়ে অন্য কিছু আমি কল্পনা ক'রে নিতে পারছি। ধরা যাক, এই ছায়াদি কোনো মানুষের নামই নয়। অরুণেশ তাঁর নিজের ছায়ার কথাই বলেছেন এখানে। নিজের দ্বিতীয় সত্ত্বার কথা। নিজের অপর লিঙ্গের কথা। তাহলে? তাহলে এই, যে, — হে তুমি আমার দ্বিতীয়/অপর সত্ত্বা, হয় তুমি আমার মুখোমুখি এসে একান্তে দাঁড়াবে, নয়তো পোশাক ছেড়ে নেমে যাবে জলে। এবং যদি জলে নেমে গেলে, তবে তোমায় আমি মুক্তি দিলাম আমার যাবতীয় বন্ধন থেকে। 'তোমার পোশাক', যা আসলে আমারই পোশাক, আমার ছায়া হয়ে থাকার শেকল, তা' 'আমি দু- হাতে ভাসিয়ে দিয়ে যাব'। 'তুমি একা খেলা করো জলে'। আমি তোমাকে হারানোর 'দুঃখ তুলে নেব বুকে'। আজীবন যে অস্পৃশ্য জলে সাঁতরেছেন অরুণেশ, সে জলকে এড়িয়ে চলেছে সভ্য নাগরিক। অরুণেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন বেশ্যালয়, শুঁড়িখানায়, মর্গে, মৃতের মুখে বসা মাছির আস্তানায়। বাংলা মদের ঠেকে দেখেছেন অলৌকিক কবিসম্মেলন। স্বাভাবিক, এই জলেই তো অরুণেশ তাঁর খড়্গ ধোবেন। এই জলেই তো ছেড়ে দেওয়া যায় নিজের ছায়াকে। যাও ছায়া, এবারে তুমিও আমার মতো ভেসে বেড়াও, খেলা করো এই অস্পৃশ্য নদীর জলে। আমাকে ছাড়াই, একাই ঘুরে নাও এই নদীতে। তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ঘোরো। খেলা করো।

প্রশ্ন হয় মনে, অরুণেশ কি চেতনার দ্বৈত- লিঙ্গ সত্ত্বায় বিশ্বাস রাখতেন? যদি রেখে থাকেন, তবে তো এক সত্ত্বা আরেককে ছেড়ে গেলে, কোনো সত্ত্বারই বেঁচে থাকার কথা নয়। এই ধাঁধার উত্তর পেতে অরুণেশের আরেকটি কবিতা দেখা যাক। এতক্ষণ আমি যা লিখলাম, সে- সবকিছুকে নীচের এই চার লাইনেই উনি বলে দিলেন। 'আমি ও ছায়াদি' কবিতাটির ২য়
পর্বও কি ভাবা যেতে পারে নীচের এই কবিতাটিকে?

নদীতে শরীর স্পর্শ

সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নদীতে নেমেছ কি শতাব্দীর শূন্য রাত্রীবেলা?
গোপনে গচ্ছিত থাক, মৃত্যু এসে মুছে দিক বিগত জন্মের কুয়াশা,
সেই ভিন্ন এক অনুভূতি, নদী কি চুম্বন করেছে অণ্ডে? নয়, কেউ নয়, একা?
হঠাৎ হয়েছে মনে, পুরুষটি মরে পড়ে আছে, পাশে স্ত্রীলোকের চুল বাঁধা।

৩.

ভারতীয় অধিকাংশ দার্শনিক মার্গে 'মৃত্যু'- কে বিয়োগ হিসেবে দেখা হয় না। এটা এই নীল রঙের গ্রহকে একটা বিরাট উপহার বৈকি। যেখানে মৃত্যু একটা যোগ চিহ্ন। এবং মৃত্যুকে একমাত্র যোগচিহ্ন দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব। ধরো, তোমার জীবন থেকে কেউ চলে গেল। ধরো তোমাদের বিচ্ছেদই হয়ে গেল। এটুকু বললে কিন্তু সত্যিই অসম্পূর্ণ বলা। আসলে তোমার জীবনে যোগ হ'ল তার চলে যাওয়া। তোমার জীবনে যোগ হ'ল তার না- থাকা। মৃত্যু একটা যোগ চিহ্নই। জীবনের সাথে যোগই তো হল আরেকটা চ্যাপ্টার। আমি যখন চলে যাব, তখন আমার মরে যাওয়া, আমার চলে যাওয়াটাও যোগ হ'ল আমার জীবনে। আরও একটা সংযোজন হল। এই মরে যাওয়া শুনলে আমার মনে পড়ছে অঘ্রাণের অনুভূতিমালা, মনে পড়ছে সেই লাইনগুলো, গাছ মরে গেলে যা পড়ে থাকে তা গাছ। পাখি মরে গেলে যা প'ড়ে থাকে, তা- ও পাখি, মৃত ব'লে অন্য কিছু নয়। একইভাবে মানুষের মন মরে গেলে যা থাকে, তা- ও মন। মৃত্যুর নিয়মে। মনে পড়ছে, রবি ঠাকুর, আষাঢ়। প্রবন্ধ। বস্তু থেকে অবকাশ চলে গেলে তখন তার মৃত্যু। বস্তু যখন যেটুকু, সেটুকু হয়েই থাকে তখন তার মৃত্যু।

৪.

লেখাটা লিখতে লিখতেই মনে এলো, অরুণেশের মৃত্যু। সেও তো জলেই। দক্ষ এক সাঁতারু কিভাবে বাড়ির পুকুরে তলিয়ে যান। রোজ যে পুকুরে তিনি নামেন, একদিন সেই পুকুরেই, সেই জলেই খড়্গ ধুতে নেমে তলিয়ে গেলেন। কোথায়? নিজের ছায়ার কাছেই?

এবারে, পুনরায় পাঠ করা যাক ওপরের কবিতা দু'টি।

কাব্যনালিসিস

এসো
উমাপদ কর

নাচগানের জন্যে
ভাস্কর চক্রবর্তী

রাস্তার প্রতিটি বাঁকের কথা আমি লিখে রাখতে বাধ্য
আমি বাধ্য মিসেস ম্যাথুজের কথা লিখে রাখতে
অর্থাৎ আমিও পুড়ছি আর গোঁফের নিচে ঝুলিয়ে রাখছি হাসি
মা সকল, তোমরা ভালো থেকো
সিঁড়ির নিচে, হাসপাতালে, ভালো থেকো তোমরা
দিন আর রাতগুলোকে ফুল আর পাতা দিয়ে সাজিয়ে তোলো।

এসো মেয়েরা, আমার সঙ্গে এসো- - -
আমি তোমাদের রেশমের মতো চুলের কথা লিখে রাখতে চাই
তোমাদের গালের আভা, আর ঝিলিক, আজও আমাকে সুখে রাখে
কী ভুল আর নষ্ট ছেলেবেলা কাটিয়েছি- - -
মরুভূমিতে আজ আছড়ে পড়ছি আমি, আমার কবিতার কোনো বারান্দা নেই।

মাথার ভেতরে যে নদী আমি তার কথা লিখে রাখতে বাধ্য।
আমি লিখে রাখি
ঘনিয়ে- আসা বিপদ আর তার গন্ধের কথা
লিখে রাখি, কাঠঠোক্‌রা আর ম্লান বেতের চেয়ারের কথা

মোরগঝুঁটির বিকেল আজ হাতছানি দিচ্ছে আমাকে
চলো মেয়েরা, একসঙ্গে যাই- - -
কুয়াশা নেমেছে, নাচগানের জন্যে এবার আমরা তৈরি হই, এসো।

(কাব্যগ্রন্থঃ আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে)

'আমি' একটি চরিত্র। কে এই আমি? হতে পারে কবি নিজে, হতে পারে রাম শ্যাম যদু মধু, কিন্তু কিছু শর্ত থাকবে তাতে, যারা স্মৃতিকাতর হয়েও স্মৃতিকেই পাথেয় ভাবেন না, যারা নিঃসঙ্গ হয়েও সঙ্গ কামনা করেন প্রবলভাবে, যারা নিজে পুড়তে পুড়তেও আর সকলের ভালো থাকা নিয়ে ভাবেন, যারা বিচ্ছিন্নতার মাঝেও বলতে পারেন 'এসো'। কবি কি আলাদা মানুষ? কী এর উত্তর হতে পারে? চিন্তাভাবনা, চলনবলনে, যাপনে, জীবনবোধে মানুষ তো ভিন্নই। কবিও এই ভিন্নতারই শরিক। হতে পারে তার ভিন্নতার কিছু আলাদা দিক থাকল। কিন্তু ভিন্ন মানুষের ভিন্নতাই এর কারণ। এর চেয়ে আলাদা করলে আসে আইসোলেশনের কথা। বিভিন্ন কারণে শুধু কবি কেন যে কোনও মানুষই নিজেকে আইসোলেটেড ভাবতে পারে, মনে করতে পারে। এখানেও কবি একক আলাদা তা মানা যায় না। তাহলে এখানে 'আমি' চরিত্রটি একটা বিশাল সার্বজনীনতা না পেলেও কিছুটা ভিন্ন মানুষের এবং কিছু শর্তাধীন। এই চলমান সমাজের কিছু মানুষ সহজেই নিজেকে রিলেট করতে পারবেন এই 'আমি'র সঙ্গে।

বিষণ্নতারও কিছু রঙ থাকে, যেমন নিঃসঙ্গতায় কিছু আলো। বিরল, কিন্তু থাকে। সেখান থেকেই এক যাত্রা শুরু হয়ে যেতে পারে ভাবনায়। মানুষের কাছাকাছি যেতে জীবনের খুব কাছাকাছি থাকতে সে সেখান থেকেই পদচালনা করতে পারে। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে স্বজনে সুজনে মেশার এই আকূতি একটা বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে। তৈরী হয় এমন এক জীবনবোধ যা অপরের সঙ্গে শেয়ার করার যোগ্য হয়ে পড়ে, অপরের মধ্যে চারিয়ে যায়, অপরের বাঁচার প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। হয়ে ওঠা ও না- হওয়ার মধ্যবর্তী যে অনুভব স্তর, রোদ ও রাতের মধ্যবর্তী যে সান্দ্র অবস্থান, চেতন ও অবচেতনের মধ্যবর্তী যে আয়েলা সেখান থেকেই শুরু হয়ে যেতে পারে মানুষ জীবনের বিশালতার গভীর অনুভব। সে অনুভবের একটি প্রকাশলিপি হয়ে উঠতে পারে একটি কবিতা।

নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও কেউ কেউ খুঁজে নিতে পারেন বেঁচে থাকার সাহস। সেই সাহস তিনি ফিরি করতেও পারেন জনপদে। এও এক অপার রোমান্টিসিজিম। এক ধরণের অনুচ্চ উল্লাস। এক আনন্দ লাভের তরিকা। একটা ধ্বসে পড়া থেকে উত্থিত হয়ে নাচগানের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। বিষণ্নতা নয়, বিষণ্নতা থেকে। স্মৃতি অবিমিশ্র সুখদুঃখের। কিন্তু তার সুখ- দুঃখ বড় কথা নয়, বড় কথা ফেলে আসা যাপনের বাঁকগুলো। প্রতিটি বাঁকের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর অছিলায় সামনের গভীর বাঁকের দিকে তার দৃষ্টি। স্মৃতি আরও কিছু

টুকরো টাকরা তুলে দিতে পারে তার ভাঁড়ার থেকে। সেখানে ভালোবাসা নামক শব্দটি খুঁজে পেতে পারে অনভিধানিক অর্থের প্রকৃত স্বাদ। সেখানেও এক বোধ, মানুষকে ভালোবাসার বিকল্প কিছু নেই।

এই এক সময় যখন পুড়তে পুড়তে গোঁফের নিচে হাসি ঝুলিয়ে রাখতে হয় ক্লাউনের মত। যখন মা সকলকে ভালো থাকার উইস করতে হয়, অর্থাৎ তারা ভালো নেই, কোথাও তারা ভালো নেই। মা সকলেরা থাকে সিঁড়ির নিচে হাসপাতালের মেঝেতে হয়ত সজ্জাহীন দিনরাত। ফুল আর পাতার সামান্য সজ্জা উপকরণও কি জুটবে? কিন্তু আগ্রহটা আছে। আবার এ ঠিক প্রত্যয়ও নয়। আগ্রহ আর প্রত্যয়ের মাঝামাঝি এক দশা।

তবু মেয়েরা এসো, এসো পর প্রজন্ম, নাচগানের জন্য প্রস্তুত হই। ভীষণ ভুলে ভরা নষ্ট ছেলেবেলা কাটিয়েও ‘আমি’ প্রস্তুত করেছি নিজেকে। ছিলাম নির্জনে নিঃসঙ্গতায় বিচ্ছিন্নতায়। সেখান থেকেই ভেবে গেছি তোমাদের কথা, তোমাদের সকলের কথা। এই দূরত্ব আমি কাটিয়েছি ভাবনায় আর মননে। তোমাদের আমি ভুলতে পারি না। ভুলতে পারিনা সেই ভালোবাসা।

মাথার মধ্যে যে নদী কাজ করে তা বহতা। কিন্তু সদা জাগ্রত থাকতে হয় সামনের বিপদ আর তার গন্ধে ম ম করা ভূবনে। দেখো, মোরগঝুঁটির উজ্জ্বল বিকেল। দেখো দেখো ‘কুয়াশা নেমেছে’। কী অসাধারণ বৈপরীত্য আর আকস্মিকতা। এরমধ্যেই এসো মেয়েরা আমরা সবাইমিলে জীবনের গান গাই।

প্রচন্ড অবসাদের মধ্যেও খুঁজে নিতে হয় বেঁচে থাকার প্রেরণা। নুয়ে পড়তে পড়তে অর্জন করতে হয় নৃত্যশৈলীর ভঙ্গীমা। একা হতে হতে একসময় অকুতোভয়ে ডাকতে হয় ‘এসো’। আক্ষেপের চূড়ান্তে গিয়ে পেছনের বাঁকগুলো দেখে নিতে নিতে সামনের গভীর বাঁকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। বৈপরীত্য আর আকস্মিকতায় ভরা সময়ের মধ্যে জাপনের মধ্য থেকে গেয়ে উঠতে হয় ভালোবাসা। তাহলেই এই কবিতাটি রচিত হতে পারে।

অনেক ইঙ্গীত আর কিছু প্রতীকে নির্মিত বাহ্যিক রূপটির সঙ্গে অন্তরের ভাবনাটির মেলবন্ধনই এই কবিতা। সহজ কিন্তু সরল নয়। আবার আপাত সহজের ইতিহাসটি বাঁধা আছে ঐ ‘আমি’ চরিত্রটির যাপনে। যেখানে উত্থানের চেষ্টা, তথা উত্থানপর্ব। যেখানে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হাঁটা। যেখানে কবিতা আসে মুক্তির আশা নিয়ে। যেখানে মেঘ জর্জরিত আকাশ এখন অংশত মেঘলা।

‘আমি’ চরিত্রটির যাপনের অভিসার, সময় নিরপেক্ষ এক সময়ের তথা আবহমানের নিরুচ্চ ডাক আর ধ্বসে পড়া থেকে উত্থানপর্বের এক নামচা এই কবিতা।

গত সংখ্যার পাঠ- প্রতিক্রিয়া

Ranjan Moitra : Chamatkar. Porhbo nischoi.

Moulinath Biswas : Japamala GhoshRoy ar Rishi Souraker lekha 2to porlam. valo kaj hachchhe. Go ahead. Shuvechchha.

Taimur Khan : শূন্যকাল ভাবনার বৈভবে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে ।

শত্রু অমায়িক : @মলয় রায়চৌধুরী। আমি এটাও পড়লাম, মৃগাঙ্ক বাবুর একটা ইন্টার্ভিউ পড়লাম, আপনার লেখা নিয়ে তো আলাদা করে কিছু বলার নেই। খুঁজে পাচ্ছিনা কিছু বই এখনো অবধি তাও আমি নিরলস ভাবে খুঁজে যাচ্ছি, সেটা নিশ্চয়ই পাঠক তানার ক্ষমতা আছে বলেই।

Tamal Ray : Bah. Abhinondon Dipankarda

Pijush Biswas : Another milestone ! Hard works ! And intelligent also !! Dipankar da has set editorial at the best, supported by poets ! Continue

Japamala GhoshRoy : Shunyakaal Webzine k avinandan.

Muktiram Maiti : Taniyar lekhay ekta nijaswa dharan achhe ... Ami kobitar ABCD bujhi na kintu valo laga thekei kobita path kori ... Ei boitar kobitagulor ekta nirdisto avimukh achhe, parikolpito uddesyao achhe bole amar mone hoy ! Sadharan kobita-premi agrahi pathak ei kobitaguli path korle abak hoye jaben - prabesh korben ek sampurno vinna analokito jagate ... Taniya dekhiyechhe je evabeo vabte para jay, evabeo sahasikatar sange sabdaguloke niye khela kora jay ... Ami personally mone kori taniyar modhhey ek baro samvabona rayechhe ... Aro anek asha railo kobir prati !

Ruhul Mahfuz Joy : Taniya Chakraborty, তোমার 'পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া' কবে যে পড়বো! @Imon Kalyan, রিভিউটাও দুর্দান্ত কবিতা হয়ে গেছে!

Swapan Roy : কবি আর বদলা একসাথে যায়না, আমি আপনার সাথে একমত....প্রণাম নেবেন মলয় দা. . .

Tapan Chakraborty : অসাধারণ ! @Malay Roychoudhury

Swapan Roy : কি ভাবে লেখো এমন? @Barin Ghosal

Indrani Dutta Panna : ki sundar lekha! @Barin Ghosal

Apurba Kumar Nath : valo laglo @Barin Ghosal

Apurba Kumar Nath : Besh @Swapan Roy

Indrani Dutta Panna : asadharan! ekebare pere felechho. @Japamala GhoshRoy

Apurba Kumar Nath : notunatwa a6e @Japamala GhoshRoy

Aryaneel Shantiputra : অসাধারণ লেখা. . . @Agni Roy

Som Sarkar : Onek chinta bhabnar fosol eta. Self-explanatory er cheye onek beshi experimental ei lekha ti. Darun laglo. Ric Sourock

Kajal Sen : তানিয়ার দ্বিতীয় কবিতা সংকলন ‘পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া’ পড়েছিলাম বইটি প্রকাশের আগেই। তানিয়া আমার কাছে পান্ডুলিপি পাঠিয়েছিল। এবং কবিতাগুলি পড়ে আমি যে শুধুমাত্র মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাই নয়, বরং আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি এর আগেও কোনো কোনো প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু তরুণতর কবি- গল্পকার- প্রবন্ধিকের বিভিন্ন লেখা পড়ার সুযোগ ঘটছে, যা পড়ে আমি সমানেই ঋদ্ধ হয়ে চলেছি। এরা সবাই শুরু থেকেই শক্ত হাতে শক্ত কলম ধরেছে। ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠার ব্যাপার এদের নেই, বরং যেন রীতিমতো পরিণত হয়েই লেখালেখি শুরু করেছে। এবং আমি স্থির নিশ্চিত, এই তরুণতর লেখকরাই ক্রমাগত বাংলা সাহিত্যের নতুনতর দিশা নির্ধারণ করে চলেছে।

তানিয়ার কবিতার বইটির নামকরণ লক্ষ্য করুন, ‘পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া’। কী আশ্চর্য তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণ! আর সাঁঝবাতি বইটির সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় কবিতার যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছে, তা পড়লেই তো বোঝা যায়, তানিয়ার কলমের বৈচিত্র্য ও গভীরতার পরিমাপ। সাঁঝবাতি নিজে একজন অত্যন্ত পরিণত কবি ও গদ্যকার। আর তাই সাঁঝবাতির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে খুবই স্বল্প পরিসরে তানিয়ার কবিতার সৌন্দর্যরহস্যকে এভাবে পাঠক- পাঠিকাদের সামনে উন্মোচিত করা। তানিয়া চক্রবর্তী ও সাঁঝবাতি, দুজনকেই জানাই আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

Somtirtha Nandi : সঠিক যাকে আলাপ বলে... তানিয়ার বইটার সাথে আলাপ হয়নি আগে, হল, বেশ ঝাড়ি মারার মত বই... আর সাঁঝবাতি, so called 'review' না করে অপরিচিত পাঠকের সাথে আলাপ করানোর জন্যে... কুর্নিশ. . .

Bikash Sarkar : তোমাকে চাইনি আমি অথচ চেয়েছি বহুদূর থেকে. . .
jaani na kaar uddeshe emon haatchhanimoy pongti, tobe taake khub hingshe hoy... @Taniya Chakraborty

Quamrul Bahar Arif : পড়ার আগ্রহটা বেড়ে গেলো @Taniya Chakraborty

Rajdeep Puri : Baho! Sundor lekha... @Imon Kalyan

Japamala GhoshRoy : দেবযানী বসু অসাধারণ নতুন কবিতা লেখেন। দেবযানী একজন ম্যাচিওরড বী। পূর্ণ মধুপ। তাঁর বুঁদ অস্তিত্ব কে কেউ আর বাংলা সাহিত্য থেকে উপড়ে ফেলতে পারবে না। দেবযানীর প্রায় প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থ আমি আত্তীকরণ করেছি। তিনি কবিতায় অদ্ভুত সব অকাট্য এবং অনুভাবী বার্তা নিয়ে আসেন!!! যেমন একটা কবিতায়য় তিনি বললেন "নক্ষত্র খুনের পালা শেষ হলে পেসমেকার পিসমেকার হবে" কি কনফিডেন্ট!! দেবযানীর সামনে পরিবিষয়ক বস্তু ছিল খোলামকুচিরর মতো পড়ে। যতদিন যাচ্ছে উনি প্রায় সমস্ত পাzলস সাজিয়ে ফেলছেন। এই পত্রিকায় আলোচিত কাব্যগ্রন্থ টিও আমার পড়া। নামকরণ থেকেই চমক এর শুরু। আলোচক তৈমুর খান এর কবিতা গদ্য সব লেখার সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। উনি একজন বিদগ্ধ লেখক। তাঁর বিশ্লেষণ ও চমৎকার। তৈমুর খান দেবযানী বসু এবং অতি অবশ্যই এইরকম একটি ঋদ্ধ আলোচনা প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক বন্ধু দীপংকর দত্ত কে অসংখ্য কুর্নিশ।

Shantanu Kabeer : কাল লেখা হয়েছিল কয়েকটি লাইন। বেশ সময় লাগছিল বলেই কি না ল্যাপটপ হ্যাং হয়ে যায়। কিছুতেই বশ না মেনে লাইনগুলোকে অদৃশ্য করে দেয়। অতএব নতুন করে লিখতে হচ্ছে।

তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতার লাইন:

নিশ্বাসের ঘনীভবন অবধি
চিলেকোঠার পাখির ওড়া অবধি
চলন্ত সিঁড়ির কোমর অবধি
বিভিন্ন রাস্তার জাতীয় পথিক হয়ে আছি
কোনো ধারে নেই বিশ্রামাগার

আবারও পড়ি : ‘বিভিন্ন রাস্তার জাতীয় পথিক হয়ে আছি
কোনো ধারে নেই বিশ্রামাগার’। এমন দুটি লাইনের কথাও যদি বলি, কীভাবে মনের মধ্যে আসে, তারপর কলমে বা কিবোর্ডে- স্ক্রিনে আসে? কীভাবে আসে? পড়তে গিয়ে কেমন যে সম্মোহন চলে আসে, আর তা আরও ঘনীভূত করে আগের তিনটি লাইন। এখানে আলোচক আমার একজন প্রিয় কবি সাঁঝবাতি লিখেছেন : ‘পড়তে পড়তে ভয় লাগে।’ তারপর চমৎকার আরও কয়েকটি লাইন। ভয়ও লাগতে পারেই তো, বিপন্নতা যেখানে ঘিরে আছে : ‘কোনো ধারে নেই বিশ্রামাগার’।

তানিয়া- র কবিতার পংক্তি : ‘ধরিত্রী তোমার গলা দিয়ে আগুন দিচ্ছে শিশুর নাভিতে’। এমন একটি অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে কোনও কবিকে কি অপেক্ষায় থাকতে হতে পারে না রাতের পর রাত?

আশ্চর্য প্রদীপ চাই
রেডলাইট এরিয়ায় গিয়ে প্রদীপের মুখ খুলে দেব

ব্রেভো, তানিয়া, ব্রেভো। এসব পঙ্ক্তি অমর হয়ে থাকবে।

এই তো তানিয়া। তাঁর সমসাময়িক অনেকের (যাঁদের কবিতা পড়া হয়েছে আমার) থেকে আলাদা। কত যে আর্তি। কবিতায় কবিতায়। সংযমেরও দীক্ষা ওঠে ফুটে।
এ ক’টা লাইন লিখতে আমার সহায়ক হয়েছে অনলাইনে পড়া তাঁর কবিতা, তাঁর আগের বইটির পিডিএফ কপি। ‘শূন্যকাল’কে এবং সাঁঝবাতি- কে ধন্যবাদ নতুন বইটির কিছু কবিতার লাইন পড়ার সুযোগ করে দেবার জন্য।

Novera Hossain : অগ্নির লেখা বরাবরই ভাল লাগে....গদ্যভাষাটা অসাধারণ.. শুভেচ্ছা. . @Agni Roy

Rupa Mukhopadhyay : Realistic. Lab notebook ba Test paper er bhetor e shukno phul..bristi r rate chhatahin phera...ar gachh er chhayar trikonmiti dirgho hooa...bastob ar swopno mishe jai, ar lekha r songe lekhok er sottao. ato poriskar chhobi...bhalo laglo, @Agni Roy.

MD Sumon Talukder : বাহ্ বেশ ভালো লাগলো

Mrinal Basu Chaudhuri : Khub valo laglo..Taniyar kabitar matoi sundar ei alochana. @Taniya Chakraborty, Imon Kalyan

Japamala GhoshRoy : বারীনদা!! হেব্বি হয়েছে লেখাটা

Japamala GhoshRoy : খুবও ভালো স্বপন দা। এমন লেখা লিখতেই পারবোনা। তাই "হাত সে ছুঁ কে রিস্তোঁ কো ইলজাম" দিলাম না @Swapan Roy

Japamala GhoshRoy : অনুপম এর কবিতা একসময় গিলে নিয়ে জাবর কাটতাম। তখন। বোধহয় প্রভাবিত হওয়ার অহং টা ছিল না।এখনো খুব সতর্কভাবে পড়ি। সংক্রামণ এড়িয়ে।তবে ওর গদ্যগুলোর জাদু এমনিই যে যতই সিনিয়রিটির ঘ্যাম দেখাই না কেন ঘুরিয়ে সেই মাথা গলাতেই হয়। এখানেও তাই হল। "১ হলনা ভাষারাষ্ট্র....." নামের মোহ কাটিয়ে সাহস করে নিজের কবিতা নিয়ে ১০০% সত্যি কথা বলা হেব্বি কঠিন কাজ অনুপম! @Anupam Mukhopadhyay

Japamala GhoshRoy : খুবও ভালো সেলফি। অগ্নির কবিতার ঈশ্বর আসলে বুভুক্ষু মানবাত্মা র ত্রাতা। অর্থাৎ সংগ্রামী মানুষটি নিজেই। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা ভালো সামঞ্জস্য আছে। যেটা সম্ভবত আত্মবীক্ষণ হয়ে উঠেছে। @Agni Roy

Japamala GhoshRoy : আবারও তোর লেখায় জীবনের ভাঙা গড়া ওঠা নামা কদর্যতা শূন্যকাল সুলভ ব্রোকেন ইমেজ শিল্পিত হয়েছে। আবারও তোর কবিতায় পরাবাস্তবতা। সুন্দর। তবে গদ্যটা উক্ত কবিতারই অনুকরণ এ লেখা অপর একটা কবিতা হয়ে উঠেছে। @Ric Sourock

Anupam Mukhopadhyay : ধন্যবাদ Japamala- দি

Barin Ghosal : রিভেঞ্জফুলি লেখাগুলো রিভেঞ্জ লেখাই থেকে যায়। কবিতায় উৎরোয় না। আপনি ঠিক বলেছেন মলয়দা। @Malay Roychoudhury

Barin Ghosal : ঘন্টা বেজে যাচ্ছে। সমস্ত শব্দে জোড়া নেমন্তন্ন কার্ড ওমের অপেক্ষায়। অগ্নি, আগুন আগুন। @Agni Roy

Barin Ghosal : ভাল লাগছিল। কিন্তু ব্যাস ? এত সংক্ষেপে তো তুই কলম তুলিস না ? শরীর খারাপ ? @Ramit Dey

Shunyakaal Webzine : বারীনদা, আমিই পইপই করে বলেছিলাম সংক্ষেপে লিখতে। তাই ফাউন্ট নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। নইলে প্রণবেন্দুর এই ৭ লাইন কবিতার জন্য রমিত ৭০০ পাতা লিখতে পারে। একে ইয়ার এন্ডিং তায় ঋতুপর্ণার জ্বর, স্বপাকে চাট্টি ফুটিয়ে

গলাধকরণ করে, বিনা মদে, বিনা সিগারেটে অ্যাকাউন্টস ফাইল থেকে প্যারালাইজড্ মগজকে খাড়া করে, কবিতায় খেদিয়ে এনে, ডেডলাইন মেনে, ভোর ৪ টে ৬ মিনিটে লেখা মেল করে, একটা মানুষ দুঘন্টার জন্য কি করে বডি ফেলে ফের ৬ টায় উঠে ব্রাশ করে চা বসাতে পারে এবং দিনের পর দিন, আমার জানা নেই।

Barin Ghosal : আমাদের মধ্যে এক বেচারা কে ? রমিত। আর কে ?

Pranab K Chakraborty : revenge hok baa natun kichhu korbaar 'ritual'...praan je achhe se uttap shabdora shaniye jachchhe. Atoyeb sutorang atoppare...jari thakuk judhho. grease your elbow. Dhannyobad. @Malay Roychoudhury

Japamal a GhoshRoy : কাব্যবিশ্লেষণ অংশে রবীন্দ্র দা সম্পূর্ণ নিজের মতো করে রবীন্দ্র গুহয়িক চালে যেভাবে দীপংকর দত্তের কবিতা বিশ্লেষণ করেছেন তা কবিকে অনুপুঙ্খ না জানলে এবং কবির কবিতা আত্তীকরণ না করলে লেখা যায় না। রবীন্দ্র দা, আপনি ই পারেন দীপংকর এর মতো কবিকে যথাযথ য়্যানালিসিস করতে। দীপংকর এর জীবনদর্শন মানে জীবনের উপর্যুপরি ঘাত প্রতিঘাত, কভি তকদির কা মাতন, কভি জিন্দেগী কা গিলা, ছিন্নমূল রক্তাক্ত অস্তিত্ব, নেশাতুরীয় মুহূর্তের উচ্ছিন্ন নস্টালজিক অনুভব থেকে উঠে আসা ভঙ্গুর চালচিত্র। জীবনিক মধুতৃষা, কখনো বা জীবনের উচ্ছিষ্ট সব আপনিই ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। বরিশাল থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লী, এবং তারপর সামগ্রিক মানসভ্রমণ এ বিশ্বায়িত হয়ে ওঠা কবি দীপংকর দত্ত কবিতায় ভাঙাচোরা ফর্ম ফর্ম্যাট ভাষাব্যবহার সব দিক থেকেই তোয়াক্কাহীন এক একা অনন্য। তাঁর কবিতার আকরিক গুহামাটি সমেত ধাতব কাঠিন্যকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমি তো তুচ্ছ, অনেক তাবড় আলোচকএর ও সাহসে কুলাবে না। ধন্যবাদ অগ্রজ রবীন্দ্র গুহ এবং কবি ও সম্পাদক দীপংকর দত্তকে।

Ranjan Moitra : দারুণ মজা পেয়েছি আপনার লেখা আর সঙ্গের গদ্যটি পড়ে। ভাল থাকুন। প্রণাম মলয় দা @মলয় রায়চৌধুরী

Ranjan Moitra : গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বারীনদা। প্রণাম নিও। কবিতা পড়া তো কবির সঙ্গে এক আশ্চর্য ভ্রমণ। সেই আনন্দ দিলে। @Barin Ghosal

Ranjan Moitra : প্রায় মুখের ভাষায় লেখা কবিতা ভাষাকে মুখসর্বস্বতা থেকে কত দূরে, কবিতার কোন আশ্চর্য ট্রেকিং এ নিয়ে যেতে পারে, এই লেখা তার উদাহরন। আর সঙ্গের গদ্য ! কেয়া বাত। @Swapan Roy

Japamala GhoshRoy : তানিয়ার সব কবিতাই আত্মখননের। ওর সব কবিতাই আমি পড়ি। আমার খুব৩ প্রিয় কবি তানিয়া। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে ওর কোন কাব্যগ্রন্থ আমি এখনো কিনে উঠতে পারি নি। না পড়ে মন্তব্য করার ধাস্টেমো না করে বরং পড়ার ইচ্ছে ও শুভেচ্ছা রইল। তবে সাঁঝবাতি, মানে ইমন, তোর উপস্থাপনার স্টাইল আমাকে মুগ্ধ করেছে। তানিয়া, ইমন দুজকেই শুভেচ্ছা

Ranjan Moitra : খুব ভাল লাগলো পড়ে । দেখার চোখটিকে শুভেচ্ছা @Japamala GhoshRoy

Ranjan Moitra : কোনো এক প্রাচীন কিস্যার গা থেকে খুলে খুলে পড়বে নিকানো ডাঙা / পথের প্রায় অন্তে এসেও বাদামি বরফ ভুলে যাবে অভিসার / তুমি তার ভূমি আমূল নাড়িয়ে বাঁকানো হাতের আঙুল নাড়াবে- - - - - - খুব খুব ভাল। গোটা লেখাটাই। গদ্যটা ভাল লিখেছ। শেষ প্যারাটি এই পুরো লেখাটির সারাৎসার @Umapada Kar

Ranjan Moitra : সবটা এখনও পড়ে উঠতে পারি নি। তবু যতটা পড়েছি তাতেই বলব অসাধারণ কাজ হয়েছে দীপঙ্কর। অনেক ভালবাসা।

Akash Dutta : ভোর নেমে এলো কবিতায়। দূরে কোথাও আরাধনা। স্তোত্র। রবীনবাবুর সুস্থতা। শ্রদ্ধা রইলো দাদা। @Barin Ghosal

Akash Dutta : দুঃখকে দুঃখিত করে লাভ কি? @Swapan Roy

Akash Dutta : অন্যরকম জার্নি। ভালো লাগলো খুব। @Japamala GhoshRoy

Barin Ghosal : কগল্পটা ভালই লিখেছিস নীল। মানে, কবিতার মধ্যে গল্পকে ইনফিউজ করে দেবার টেকনিকটা সুপার্ব হয়েছে। এনকোর। @Nilabja Chakrabarti

Barin Ghosal : বেশ বেশ। ভাবিছিলাম পুরোটা কেটে দিলে কেমন লাগতো ? অনুপম, ট্রিগার শব্দকে হাইলাইট করাটা কবির পক্ষে দুর্বলতা মনে হয়। পুরোটা কেটে দিলে আরোপিত জটিলতা সম্পূর্ণ হবে আমার বিশ্বাস। দেখবি নাকি একবার ? ভাল লেখার এই বিপদ। আমার মতো উটকো পাঠকের অত্যাচার সইতে হয়। হে হে। @Anupam Mukhopadhyay

Akash Dutta : অদ্ভূত সমীক্ষা। ভীষণ বাস্তবিক। @Agni Roy

Akash Dutta : আগেও পড়েছি। আবার পড়লাম। একইরকম ভালোলাগা। @Ric Sourock

Anupam Mukhopadhyay : আমি তো আপাতত আপনার কমেন্টটাই কেটে রাখলাম Barin- দা

Barin Ghosal : লেখাটা গড়গড়িয়ে পড়ার সময় যে আনন্দ হয়, ভাল লাগে, সেখানে ভিজে লিঙ্গ দেখে হতাশ হই জপমালা। খুব স্মার্ট লেখাটা। @Japamala GhoshRoy

Ashoke Tanti : নবান্নের গান। @Japamala GhoshRoy

Ranjan Moitra : কি ঘর বানাইলা বিধি শুন্যের মাঝার। একটা কল্পিত ভূমি- অবস্থান। তাকে নানা দিক থেকে সমস্ত সম্ভাবনায় দেখা যখন একটা গঠন গড়ে উঠছে। কখনো না থাকা বই দুটোর খোলা পাতার ওপর যে ভাবে শীত এবং বসন্ত পর্যায়। গড়ে ওঠে । আর তার আঁকে বাঁকে নজরে আসে আমাদের প্রবেশ ও পলায়ন। নাকি এস্কেপ। পুরো লেখাটা জুড়ে একটা গাঢ় আয়না- র ফুঁ পাঠককেও স্পর্শ করার কথা। এবং স্বীকার্য যে, এ লেখাটিতে ঠিকঠাক প্রবেশ করার এখনো ঢের বাকি আমার। অভিনন্দন নীলাব্জ। @Nilabja Chakrabarti

Preetha Roy Chowdhury : অসাধারণ @মলয় রায়চৌধুরী

Pranab K Chakraborty : asadharon Dipankar Dutta ebong tader team niye shunnyokaal fank kore alo dhele deyar sarojantra. Valoi douruchhe.....

Barin Ghosal : মৈথুন দারুণ জমেছে রে উমা। পাঠে খুব আরাম। @Umapada Kar

Braja Kumar Sarkar : ভাল লাগলো শূন্যকাল আন্তর্জাল পত্রিকাটি। দীপঙ্কর বাবু আমাকে নিয়মিত মেল করে পাঠান কিন্তু আমি সময় করে পড়তে পারিনি, এটা আমারই দোষ। এই সংখ্যায় বারীনদার গদ্য লেখার সাথে কবিতা গুলি পড়ে চমকে উঠেছি, এই কবিতাগুলি

কোন বারীন ঘোষাল এর লেখা!! বারীনদার কবিতা এত কাল ধরে যা পড়েছি, তার সাথে এই কবিতাগুলি যেন আলাদা। খুব ভাল লাগলো। আরো কিছু বলতে চাই কিন্তু আজ আর পারছি না। সম্পাদক মশাইকে ধন্যবাদ । শূন্যকাল জিন্দাবাদ। ব্রজ কুমার সরকার, সম্পাদক- ত্রিষ্টুপ, দুর্গাপুর। @Barin Ghosal

Nilabja Chakraborty : Barin দা... Ranjan দা... অনেক ধন্যবাদ... কৃতজ্ঞতা... ভরসা পেলাম. . .

Bhaswati Goswami : What a journey.....ohhh.....kudos Barinda @Barin Ghosal

Suman Mallick : চরম। উদ্দীপিত হলাম। @মলয় রায়চৌধুরী

Bhaswati Goswami : Ak nodir saathe cholte cholte.... tonmoyo ta e nijeke khoano.... porikroma sheshe, kobita moy hoe uthhi.....chup kore thaklei bodh hoy jathartho hoto.....Swapanda.... @ Swapan Roy

Ranjan Moitra : গদ্যটা দারুণ। @Agni Roy

Ranjan Moitra : দীপঙ্করের কবিতায় তীব্র গতি, ভাষাকে প্রায় ছেতরে দেওয়া, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বৈদ্যুতিক ওভারল্যাপিং এবং একই গতিতে ফিরে আসা, তথাকথিত কন্টিনিউইটি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রায় হেতার চালানো আয়োজন- - - এই সবই তার একান্ত অভিজ্ঞান । এই কবিতাতেও তার সবই উপস্থিত। এবং রবীনদার গদ্য। চমৎকার।

Ranjan Moitra : পাতা ঝরছে ম- ম- মালিকানায়। ১ হচ্ছে না। ভাষারাষ্ট্র । কবরকে প্রদেশ বলছেনা।- - - এই হল তোর বলার কথা। তার জন্য উৎসকে 'মা পত্নী কন্যা যোনি বোঁটা' সব খুঁড়তে খুঁড়তে এলি । কবর খোঁড়ার মতো নয়। কবরের আভাসও নয়। তাহলে শেষমেশ একটা চাপা দেওয়ার ব্যাপারও এসে পড়ত। তোর গদ্যটি না থাকলে তোর এই ভাবনা- চলন স্পর্শ করা আমার পক্ষে কঠিন হত। আমার ছোটবেলাটা বাঁকুড়ার । তাই মামেগো শব্দটি বহু কাল পর কবিতায় দেখে চমকে উঠেছিলাম। লস্ট কোথায় রে ! দিব্যি হুঁশিয়ার । ইংরিজিতে মাদারফাকার করলি। কিন্তু হিন্দিতে সংযত হয়ে কমিনে বললি। না বোন বলবি বলে বলেছিস এরকম নয় কিছুতেই। অবশ্য মাদারফাকার শব্দটি নিতান্তই ফ্ল্যাট । মামেগো - র সংকেত ওর মধ্যে নেই। সুরক্ষিত ও সম্মানিত সত্যিই বাড়তি। কেটে দিয়ে ভালো করেছিস। কিন্তু

অনুবাদের শব্দটাকে কেটে হাইলাইট করার দরকার ছিল কিনা ভাবছি। কবরকে প্রদেশ বলতে চাওয়াটাই তো অনুবাদ। ওই শব্দটা ওখানে বরং কানকে জ্বালাচ্ছে । @Anupam Mukhopadhyay

Anupam Mukhopadhyay : রঞ্জন রশ্মি

Souvik Bandopadhyay : Ric Sourock, ভালো লাগল। নিরীক্ষামূলক